

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর য়্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জন্সন্ রোড্, ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৫২

প্রিণ্টার—
শ্রীমধুসূদন নাগ
আশুতোষ প্রেস,
ঢাকা

সূচী

ছোট-ভাই মোর স্নেহের 'রতন'! আজিকে তোমার তরে
[illegible] তুলে এ গল্প-গুচ্ছরা
ছিলাম ছোট তব 'রতনেই' ভরা
[illegible] তুলে; মোর অন্তরের বাণী
[illegible] দিলেম [illegible] ।
তোমার [illegible]
—'[illegible]'—



গাড়োয়ান লকড়ি উঁচিয়ে বললে—"সামনে ঐ রহমৎপুরের জলা।"

ছইয়ের নীচে শশী বেয়ারার কোলের কাছে বসেছিল রতন। সে সভয়ে সেইদিকে তাকাল। যতদূর দেখা যায়—কেবল জল; বাতাসে তার বুকে ঢেউ উঠছে, মেঘের ছায়ায় হয়ে আছে কালো।

শশী কোন উত্তর দিলে না, একমনে তামাক টানতে লাগল।

বাঁয়ের গরুটিকে একটি ঠেলা দিয়ে ডাইনের গরুটার ভিজে পিঠের উপর এক ঘা লকুড়ি মেরে, গাড়োয়ান আবার বললে—"শুনলে বেয়ারার পো ?"

—"কি ?"

—"সামনে ঐ দেখা যায় রহমৎপুরের জলা।"

—"টেনে চল।"

—"এই কাদায় গরুর পা যাচ্ছে বসে—"

—"তবে আস্তে চল।"

—"তোমার জন্য আজকে জান্‌টা—"

রতন শশীর একেবারে কোল ঘেঁসে স'রে বসল। শশী তার কাঁধে ভারী হাতখানা একবার রেখেই নামিয়ে নিয়ে গাড়োয়ানকে বললে—"তোর জান্‌ কেউ মারবে না।" তারপর রতনের হাতখানা ধ'রে তার দিকে একটু ঝুঁকে বললে—"ভয় নেই। চুপ ক'রে ব'সে থাক।"

—"কিন্তু শশীকাকা, তুমি ত একা!"

—"একা কেন ? তুইও আমার সঙ্গে লাঠি ধরবি।" ব'লে সে মোটা ও ভাঙ্গা গলায় হা-হা ক'রে হেসে উঠল। তার কালো মুখে দাঁতগুলোকে দেখাতে লাগল বড় বড মুক্তোর মত। রতন ফিরে দেখল, শশীর লাল ও বড় চোক দুটোকে দেখাচ্ছে আরও লাল, আরও বড়।

গাড়োয়ান বললে—“সেই দুপুর থেকেই তোমাকে তাড়া দিলাম—”

—“তোর যেমন বুদ্ধি! কুটুমবাড়ী থেকে আসবার জন্যে কেউ মারামারি করে? বিশেষত এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে? তা'রা যখন ছাড়বে, তখনই ত আসা দরকার। গাড়ী চালিয়ে বেটার বুদ্ধিও হয়েছে গরুর মত।”

রতন বললে—“কাকা, তুমি রহমৎপুরের ডাকাতদের দেখেছ কখনও?”

“তা'রা আমার সামনে বেরোয় না।” ব'লে সে কল্‌কেটা গাড়োয়ানের দিকে বাড়িয়ে বললে—“ধরগো।”

গাড়োয়ান কল্‌কেটা তার হাত থেকে নিতে, সে পাকা বাঁশের ভারী লাঠিখানাকে একটু নেড়ে-চেড়ে রেখে সামনের জলার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেলা বেশি নেই, যেটুকু আছে জলার ধারে পৌঁছুতেই যাবে শেষ হয়ে। মেঘের ছায়াটা ক্রমে হয়ে উঠছে আরও ঘন। এক এক সময় মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টি আসে! পথের দু'পাশ থেকে দলে দলে ব্যাঙ্‌ ডাকছে; মাঠে এক এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে জল। বাঁশঝাড়ের মাথায় মনোদুঃখে ব'সে আছে দু'-একটা মাছরাঙা। পথে হাঁটু-সমান জল-কাদা। তার উপর দিয়ে রতনদের গাড়ী চলছে কষ্টে ও আস্তে।

হঠাৎ রতন ব'লে উঠল—"শশীকাকা, যদি ডাকাতেরা আমাকে মেরে ফেলে ?"

মোটা, চওড়া, খসখসে হাতখানা দিয়ে শশী তার পিঠে আস্তে একটা থাবা মেরে বললে—"কে মরে ব'সে ব'সে দেখিস্।... ওরে ছমির ! ঐ বাঁয়ে সেই পোড়ো বাড়ীটা দেখা যায় না ?"

—"হুঁা।"

—"চারধারে চোখ রেখে চল্।"

রতনের বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে এল। শশী লাঠিখানা বাঁ-পাশ থেকে নিয়ে রাখল ডান পাশে ; কোমরের কাপড়টা পরল আরও শক্ত ক'রে ; মাথার লম্বা চুলগুলো একটু ফুলিয়ে, গোঁফে চাড়া দিয়ে ব'লে উঠল—"গুরু বল—গুরু বল !"

রতন তাকিয়ে দেখল, তাদের শশী—তার শশীকাকা—নিজেই যেন ডাকাতের সর্দ্দার ! তার হাতের আঙুলগুলোকে দেখাচ্ছে লোহার মোটা গরাদের মত। সে বইয়ে পুরুষ-গরিলার হাত ও বুকের যে ছবি দেখেছে, শশীকাকার হাত দুখানা ও বুকটাকেও লাগছে সেই রকম। তাকে তার ভয় করতে লাগল।

গাড়ীখানা তখন এসে পড়েছে জলাটার ধারে ; পথও আর দেখা যায় না। বাঁয়ে দেখা গেল একটা আলো। বৃষ্টিও

পড়তে শুরু হ'ল সূক্ষ্মধারায়। বৃষ্টিধারার, বাতাসের, জলার বুকে ঢেউয়ের, গাড়ীর চাকার ও গরুর পায়ের শব্দ এবং ব্যাঙের ডাক, একসঙ্গে মিশে একটা বিশ্রী কান্নার মত শোনাতে লাগল। রতন তাকিয়ে দেখলে অন্ধকারে আগুনের ফুলকির মত এদিকে-ওদিকে জোনাকি ভেসে যাচ্ছে; আর বাঁয়ে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে রক্তজবার মত একটা আলো।...

গাড়ী চলেছে। ছ'পাশে জলা। তার ছল্-ছল্ শব্দ এবার হয়েছে আরও স্পষ্ট। এই জলাটা পার হ'লেই একখানা গ্রাম, তার পরের গ্রামে রতনদের বাড়ী। সেখানে পৌঁছতে হবে রাত ছপুর। এবার ভয়ে তার ছ'চোখে জল এল।

হঠাৎ শশী বাঘের মত গুঁড়ি মেরে, তার ঠিক সামনে গিয়ে ব'সে, সতরঞ্চির তলা থেকে খড়গুলো পড়্-পড়্ ক'রে ছিঁড়ে, তা দিয়ে কি করতে লাগল এবং একবার ব'লে উঠল—"ছমির, গাড়ী রুখতে দিস্ নে। সোজা চালাবি। শালাদের গন্ধ পাচ্ছি।"

—"মাথা যদি বাঁচে, তবে ত?"

—"তুই এক কাজ করবি,—গাড়ীর নীচে পালাবি—"

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই হঠাৎ সামনে দেখা গেল ছটো ছায়া-মূর্ত্তি; সেই সঙ্গে সামনে থেকে কে ব'লে উঠল—"কোথাকার গাড়ী?"

ছমির বললে—“ময়নাগড়ের।”

—“যাবে কোথায়?”

—“নন্দনপুর—”

—“কার বাড়ী?”

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে শশী ব'লে উঠল—“তোর এত খবরে দরকার কি?”

তার হাতে জ্বলছে খড়ের নুড়ো। সে আবার বললে—“স'রে যা—”

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মাথায় পড়ল লাঠি। তবে সবটা লাগল না, আঘাতের খানিকটা লাগল তার মাথার ডান-দিকে। জায়গাটা ফেটে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে রক্ত এল বেরিয়ে।

শশী তখন হয়ে উঠল আহত বাঘের মত। হাতের নুড়োটা ছমিরের শূন্য আসনে ফেলে, তার হাতের কাছে যে মূর্ত্তিটা ছিল, সে তারই কাঁধে দিলে এক ঘা। তারপর গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে, হাঁক দিয়ে বললে—“আয় শালারা! শশী বেয়ারা—”

কিন্তু তার কথা শেষ হ'ল না, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন। বৃষ্টি তখন থেমে এসেছে; টানা-বাতাসে নুড়োটা ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলছে। সেই আলোতে চারজনকে দেখাতে লাগল চারটে উন্মত্ত পিশাচের মত! তাদের লাঠি ঘুরছে,

ধুপধাপ আঘাতের শব্দ হচ্ছে। কিন্তু গরু দুটো দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে যেন কাঠের পুতুল!

হঠাৎ শশীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন শুয়ে পড়ল কাদায়; একজনের হাত গেল ভেঙ্গে, আর একজনের বাঁ-ধারের কানটা পড়ল ঝুলে। তা'রা আর দাঁড়াল না। শশী প্রথমে যাকে মেরেছিল, সে পালিয়েছিল আগেই।

শশী লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগল—"আয়! শশী বেয়ারার উপর লাঠি-বাজি! দেখি, তোদের হিম্মৎ কত!"

কিন্তু তার সঙ্গে যারা লড়বে, তা'রা তখন জল-কাদা ভেঙ্গে আহত শরীরে বহু কষ্টে ছুটছে!

শশী গাড়ীর উপর উঠে ছইয়ের নীচে গিয়ে ডাকল—"রতন—রতন রে! শালাদের ··একি! ছেলে কোথায় গেল?"

সে আর একটু ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে দেখে—সতরঞ্চির নীচে একটা অসাড় দেহ! হঠাৎ তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি সতরঞ্চিখানা সরিয়ে, একেবারে সেদিকে ঝুঁকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলে, সে রতন।

সে ডাকল—"ও রতন—রতন! হাঁ-হাঁ—ভয় নেই··· ভয় নেই···শালারা সব পালিয়েছে। তুই না আমার সঙ্গে লাঠি ধরবি বলেছিলি।" তারপর পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকল—"ছমির! ওরে ছমির!"

তার ডাক জলের উপর দিয়ে বহুদূরে ভেসে গেল; কিন্তু ছমিরের সাড়া পাওয়া গেল না।

—"সে শালাও পালিয়েছে। যাক—আয় তুই আমার কাছে স'রে—" ব'লে সে রতনের হাত ধ'রে টেনে এনে তাকে ছইয়ের মুখে বসিয়ে নিজে গিয়ে বসল ছমিরের আসনে। গরু দুটোকে ঠেলা দিতে যাবে এমন সময় সে আবার ব'লে উঠল—"ও কাত্‌রাচ্ছে কে রে? ছমির নাকি! দাঁড়া দেখি—একটু আগুন জ্বালি।" ব'লে, সে বাঁ হাতে একমুঠো খড় টেনে নিল। তার ডান হাতে চোট লেগেছিল খুব, মাঝের আঙুলটা বোধ হয় ভেঙ্গেই গেছে।

সে আগুন জ্বেলে দেখে, কাদায় একজন প'ড়ে আছে। তার মুখখানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

লোকটা আলো দেখে উঠবার চেষ্টা করল।

শশী তার দিকে তাকিয়েই ব'লে উঠল—"আরে! এ যে এক শালা ডাকাত। শালা কি এখনও কামড়াবার মতলবে আছে।"

লোকটা জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—"দাদা—বাঁচাও—শেয়ালে খাবে—ওরা পালিয়েছে।"

"তুই যে হাসালি! তোকে বাঁচাব আমি? একটু আগেই ত তুই আমার প্রাণ নিতে চেয়েছিলি?"

—"দা—দা, বাঁ—চা—ও।" ব'লে সে শশীর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—"হেঁ—হেঁ—ওঠ—"

—"পা—র—ব না, হাঁ—টু···ভেঙ্গে···চো-য়া-লের হা-ড় ···তোমার লা—ঠি—"

—"আমারও মাথা ফেটেছে—হাতের আঙ্গুল ভেঙেছে—পিঠ কেটে গেছে—তবুও তো শালাদের এখনও···আয়—ওঠ—" ব'লে



শশী তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে গাড়ীতে শুইয়ে দিতে দিতে বললে—"খবরদার, নড়া-চড়া করিস নে···হেঁইয়ো—টক্-টক্।"

গাড়ী আবার চলতে লাগল।

—"বাবা রতন! ভয় করছে না! এঃ! কি অন্ধকার! ছমির শালা পালাল!...তোর নাম কি রে?...হেঁই টক্-টক্-হো!"

—"মা—ধ—ব।"

—"তোর এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন?"

—"খে—তে পা—ই—নে। উঃ!—মা—রে!"

—"হুঁ! খেতে পাস্‌নে! এবার জেল হবে। সেখানে সব রকম খেতে পাবি—"

—"দা—দা, তোমার পায়ে—"

রতন বললে—"শশীকাকা, তুমি ওকে কেন তুলে নিলে?"

—"কেন নিলাম! তা চল্, বাড়ী গিয়ে দেখবি।"

শশীর হাত ও মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, পিঠটা কন্-কন্ করছে। নাড়া পেয়ে পিঠের ও মাথার ক্ষত দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। রতনের নাকে লাগছে রক্তের গন্ধ। ম্লান আলোয় সে শশী ও মাধবের রক্তমাখা মুখ দেখে, মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল।

শশী যথাশক্তি গরু দুটোকে উত্তেজিত করছে। কোন রকমে জলাটা পার হ'তে পারলে হয়।

—"ঘুম পেয়েছে বাবা! ঘুমো তুই—"

"না ঘুম পায় নি" ব'লে রতন শশীর পিঠে হাত দিল। তার হাতে লেগে গেল রক্ত। সে ব'লে উঠল—"শশীকাকা, একি?"

—"জল—হাতটা ছইয়ের গায়ে মুছে ফেল।"

রতন বুঝলে—সেটা জল নয়, রক্ত; বললে—"শশীকাকা! শীগ্‌গির বাবার কাছে চল।"

—"তা নইলে আর কোথায় যাচ্ছি। ঐ তো সামনে গাঁ, আলো দেখা যাচ্ছে।"

একটু পরেই গাড়ী গ্রামে ঢুকল। পথের পাশে বটতলায় মুদির দোকানে তখনও আলো জ্বলছে। সেখানে কয়েক জন ব'সে গল্প করছিল, তামাক টানছিল। তাদের একজন ব'লে উঠল—"গাড়ী কার?"

—"সিধু ডাক্তারের।"

দোকান থেকে খানিকটা আলো গিয়ে শশীর পায়ে পড়ল।

একজন ব'লে উঠল—"গাড়ী চালায় কে? শশী না?"

—"হুঁ।" শশী থামল না, তেমনি গাড়ী চালিয়ে চলল।

গাড়ী যখন গ্রামে পৌঁছে হুড়মুড় ক'রে সিধু ডাক্তারের উঠোনে গিয়ে উঠল রাত তখন অনেক। তাদের সাড়া পেয়ে বাড়ীটা উঠল সচেতন হয়ে। ডাক্তারবাবু আলো হাতে বেরিয়ে এলেন। শশী গাড়ী থেকে নামতেই তিনি ব'লে উঠলেন—"একি! শশী, তোর মাথায়, মুখে, কাপড়ে রক্ত! রতন কৈ?"

রক্তের নাম শুনে সকলেই এল ছুটে।

গাড়ীর গরু দুটো না খুলেই, সে রতনকে কোলে ক'রে সিধু ডাক্তারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—"এই নাও তোমার ছেলে। আর ঐ গাড়ীতে আছে আমার শালা। পথে ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে মারামারিতে ওর বড্ড চোট লেগেছে ডাক্তার! চিকিচ্ছে কর—"

—"তোরও যে চিকিৎসার দরকার! হরি—হরে, শীগ্গির আয়! চল্—চল্—"

—"আরে আগে ওকে বা'র কর—হরিচরণ, আয় ধর" ব'লে শশী গরু দুটো খুলে গাড়ীখানা উঠোনের একপাশে ঠেলে দিয়ে, হরিচরণের সঙ্গে মাধবকে বা'র করতে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"কি লোক! নিজের কথা একটুও ভাবে না! ওঃ! পিঠটাও কেটে হা ক'রে আছে! শশী! শশী! তুই ওকে ছেড়ে দে। আয়—চল—"

—"দাঁড়া রে বাপু।" ব'লে সে হরিচরণের সঙ্গে মাধবকে ধরাধ'রি ক'রে এনে বারান্দায় শুইয়ে বললে—"চিকিচ্ছে কর। বলেছিলে সেদিন—তোমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার—বাগানের কাজ করবে। এই একে রাখ—আমার শালা—খেতে পায় না—গরিব—"

—"আচ্ছা সে সব পরে হবে—আগে চল্।"

তারপর ডিস্পেনসারি ঘরে গিয়ে তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ

বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—"শশী। তোর শালা ছিল ব'লে ত জানতাম না।"

—"শালা আমার বরাবরই আছে। দরকার হয় না, তাই কাউকে বলি না। ও না থাকলে আজ কাকা-ভাইপোতে বাড়ীই আসতে পারতাম না! তুমি ওকে রেখ দাদাবাবু—"



ডাক্তারবাবু · পিঠের আঘাতটার চিকিৎসা করতে লাগলেন

—"তোর কোন্ কথাটা না রাখি? তবে যে চোট ওর লেগেছে! আগে বাঁচুক!"

—"কি বলছ? বাঁচবে না? লাঠিটা এত জোরে—?"

—"না, তা বলছি সারুক—"

—"তাই বল। চাষার জান্! অনেক সয়। ও মারা গেলে আমার বড় দুঃখ হবে ভাই।"

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার পিঠের আঘাতটার চিকিৎসা করতে লাগলেন। মাধবের সঙ্গে শশীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মনে একটু সন্দেহ লেগে রইল।

বাঁধা-ছাদা হয়ে গেলে দু'জনকে বললেন—"শালা-ভগ্নীপতিতে এবার চুপচাপ শুয়ে থাক। কাল সকালে সব শুনব। চল রতন—"

কিন্তু পরদিন শশীর আর সাড়া পাওয়া গেল না। সে শৈশবে একদিন যেমন হঠাৎ তাঁদের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে চ'লে গেছে। কেবল প'ড়ে আছে তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা আর তার নানা স্মৃতি।

ডাক্তারবাবু তার দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটে বার বার চোখ মুছতে লাগলেন।



তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। ডোবার ধারে বাঁশবনের মাথায় সূর্য্য নামে-নামে। লালু উঠোনের এক কোণে ছেঁচ-তলার ছায়ায় ব'সে বেলের আঠা দিয়ে খবরের কাগজের ঘুড়ির প্রকাণ্ড লেজ তৈরী করছিল। লেজ না হ'লে ঘুড়ি উড়তেই চায় না; কেবল নেমে পড়ে।

তার খুড়োমশায় ডাকলেন—"নেলো!"

লালু তাড়াতাড়ি আঙ্গুলের আঠা কাগজে মুছতে মুছতে উত্তর দিলে—"যাই"; তারপরে ছুটে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

খুড়োমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করছ ?"

লালু নখ খুটতে খুটতে চুপ ক'রে রইল। খুড়ীমা ঘরের কোণে মাতুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছিলেন। লালুর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন ; বললেন—"কি আবার করবে ? যা করে।"

খুড়োমশায় চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার ঘুড়ি ? সেদিন যে তোমাকে বারণ ক'রে দিয়েছি, আর ঘুড়ি উড়িও না। মনে নেই, তারাচাঁদ ডাক্তারের ছোট ছেলে পচার সঙ্গে মারা-মারির কথা ?"

লালু ঘাড় নেড়ে জানালে—"হাঁ।"

—"তবে যে আবার ঘুড়ি ওড়াচ্ছ ?"

—"ঘুড়ি ওড়াই নি ; তৈরী করছিলাম—"

তার উত্তর শুনে খুড়ীমা হেসে ফেললেন ; খুড়োমশায় আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। চাদরখানা গলায় তুলতে তুলতে বললেন—"আজ তোমাকে হাটে যেতে হবে ; আমি পারব না। আমার এখনই কাছারি যাওয়ার দরকার। কি আনতে হবে তোমার কাকীমার কাছ থেকে শুনে, টাকা নিয়ে রওনা হও—" ব'লে তিনি ঘরের কোণ থেকে হারিকেন-লণ্ঠন ও ছাতা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে নীচে নামলেন। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন—

"দেরী ক'রো না, এই বেলা যাও। না হ'লে ফিরতে রাত হবে—" ব'লেই ধানের গোলার পাশ দিয়ে উত্তরদিকে চ'লে গেলেন।

দূর থেকে একবার তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বোধ হয় বেগুন ও লঙ্কা ক্ষেতে গরু ঢুকেছিল; তাড়িয়ে দিলেন। লালুর মনে পড়ল, বাগানের হুড়কোটা কাল সে ভেঙ্গে ফেলেছে। চাকর নিতাই এখনও একটা নূতন হুড়কো তৈরী করে নি। ভাগ্যে খুড়োমশায় জানেন না, কার কাজ। নিতাইকে একটা পয়সা দেবে ব'লে, ব্যাপারটা চেপে রেখেছে।

খুড়ীমা বললেন—"নেরে ছোঁড়া! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যেতে হবে না?" ব'লে তিনি কাঁথা ফেলে উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন—"আজ তোর মাসী আসবে জানিস্ না?"

—"মাসীমা আসবে! কখন?"

—"সন্ধ্যে বেলা। তা'রা আজ সকালে রওনা হয়েছে। নৌকোয় আসতে সারাদিনই ত কেটে যায়। যা, জামা গায়ে দিয়ে আয়—"

মাসীমা লালুকে সেবার যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। লালু বললে—"ওঃ কেয়া মজা!"

সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে বাঁশের আলনা থেকে তার জামাটা পেড়ে গায়ে দিল, কোমর আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

খুড়ীমা রান্নাঘর থেকে খালুইটা এনে উঠোনে রেখে আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বা'র ক'রে বললেন—"এই নে—বেশ ভাল দেখে একটা মাছ আনবি। আর ঐ সঙ্গে তু'পণ



পান, আধসের সুপুরী, চার পয়সার খয়ের। আর যদি পাস্ ত সের খানেক আলু কিনিস্—"

—"এত সব আনব কিসে?"

—"কেন, অত বড় খালুইটাতে ধরবে না? তবে ঐ ছোট খালুইটাও নে।"

লালু খুড়ামার হাত থেকে টাকাটা নিল। খুড়ীমা বললেন—"টাকাটা কাপড়ের খুঁটে বেশ ক'রে বেঁধে পেটের সঙ্গে গুঁজে রাখ।"

"ভয় নেই, হারাবে না।" ব'লে, খালুই দুটো হাতে তুলতেই লালুর মনে পড়ল, তার ঘুড়ি, লাটাই, ঘুড়ির লেজ, কাগজ, আধখানা কাঁচা বেল, হেঁসোখানা ছেঁচতলায় প'ড়ে আছে। হেঁসো দিয়ে সে কাগজ কাটছিল। সে খালুই দুটো মাটিতে নামিয়ে তার জিনিসগুলো ঢেঁকী-ঘরের কোণে রেখে এল। তারপর ছুটে এসে খালুই দুটো হাতে তুলে তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

গাঁ থেকে ফকিরগঞ্জের হাট দেড় ক্রোশ, মাঝে একটা নদী। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে—বৃহস্পতি ও রবিবারে। সেদিন রবিবার। আধক্রোশের মাথায় খেয়াঘাট। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার ধ'রে ক্রোশটাক গেলেই হাট। দূর থেকে হাটের ধারে বড় বটগাছটা দেখা যায়। নদী পার হ'তে হ'তে হাটের ঘাটের নৌকোগুলোও চোখে পড়ে। হাটের ওধারেও একটা খেয়া আছে। সেটা দিয়ে হাট কাছে হয়; কিন্তু এপারে হাঁটতে হয় ঠিক ওপারের সমান।

লালু চলেছে। জোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জনকয়েক জোলা সঙ্গী হ'ল।

তা'রাও হাটে যাচ্ছে। কেউ নিয়েছে এক মোট নূতন গামছা, কেউ নিয়েছে সুতো, কেউ নিয়েছে চাদর।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো নালু বাবু! হাটে যাবে নাকি?"

—"হাঁ—"

—"তা একা যে! নিতাই কৈ?"

—"জানিনে—"

জোলাটা নিজেদের মধ্যে একজনকে বললে—"বুঝলে গো চাচা, মাধববাবু মরার পর ছেলেটার ও হাল হয়েছে।"

—"ছাড়ান দেরে ভাই; ভদ্দর নোকের কথা—"

জোলাপাড়ার পর প্রকাণ্ড ধান-ক্ষেত। আলে আলে যেতে হয়। ক্ষেত পার হ'লেই খেয়াঘাট, ঘাটের উপর পাটনীর ঘর। তার সামনে একখানা নৌকোর ভাঙ্গা ছই, কতকগুলো ছোট ছোট বাঁশ ও একটা গলুই প'ড়ে আছে।

লালু ক্ষেত পার হযে সেখানে গিয়ে দেখলে খেয়া ওপার থেকে রওনা হয়েছে। জনকয়েক হাটুরে বেসাতি নামিয়ে ব'সে গল্প করছিল। লালু তাদের কাছে না ব'সে ভাঙ্গা ছইটার উপর গিয়ে বসল। খেয়া ভিড়তে এখনও কিছু দেরী।

তারপর খেয়া-নৌকো ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে সে পাড দিয়ে নীচে নেমে সকলের আগে গিয়ে খেয়ায় উঠল। হাটের বেলা; দেরী করা চলে না। যাত্রী নিয়ে তখনই খেয়া ছাড়ল।

খেয়া চলেছে। এদিক-ওদিক দিয়ে ডিঙ্গি ও ব্যাপারিদের হু'-একখানা বজরা বা পানসী যাওয়া-আসা করছে।

লালু বসেছিল ধারে পা ঝুলিয়ে। পাটনী বললে—"স'রে বস। হাতে দড়ি দেবে নাকি? ঐ টানে একবার পড়লে নিয়ে যাবে সেই মহেশপুরের ঘাটে।" কিন্তু লালু পাটনীর কথায় কান দিল না। পায়ের নীচে দিয়ে নদীব স্রোত যাচ্ছে, দেখে তার বড আনন্দ।

পাটনীর ভাই সকলের কাছে পারানির পয়সা আদায় করছে। কেউ বলছে—"কাল দেব", কেউ বলছে—"ফিরতি বেলা", কেউ ট্যাঁক থেকে পয়সা বা'র করছে। লালুর কাছে এসে সে পয়সা চাইতেই পাটনী বললে—"বোসমশায়ের ভাইয়ের বেটা।" পাটনীর ভাই লালুর কাছে আর পয়সা চাইলে না।

লালু তার পাশের লোকটির সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে। নদী কোথা থেকে আসে, পাহাড় কি রকম, ষ্টিমার কেমন ক'রে চলে এবং উড়োজাহাজ কেমন দেখতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার অনর্গল বক্তৃতায় পিছন থেকে একটা লোক ব'লে উঠল—"তুমি উকিল হবে বাবু।"

শুনে লালুর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তার বক্তৃতা থামে না, লোকগুলো তার কথায় আর কান দিলে না।

খেয়া পারে পৌঁছল, কিন্তু টানে ঘাটে ভিড়তে পারল না, ভাটিতে কিছু দূর চ'লে গেল। জায়গাটায় উঁচু পাড়। তার গায়ে গাঙশালিখের বাসা। যাত্রীদেরই একজন দাঁড়ে বসেছিল। নৌকো উজিয়ে গিয়ে ঘাটে লাগল। তখনও লগি পোঁতা হয় নি। লালু লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামতেই নৌকোর উপর থেকে কে যেন বললে—"ওরকম ক'রে নেম না হে। হাত-পা ভাঙ্গবে।"

লালু ফিরে দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত শশধরবাবু। সে জিভ কেটে পাড দিয়ে তাড়াতাড়ি তীরে উঠে হাটের পথ ধ'রে চলল।

সামনে একপাল গরু ও ছাগল হাটের দিকে চলেছে। তাদের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। সে পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙ্গে ছুটতে ছুটতে তাদের ছাড়িয়ে গেল।

ঐ যে ফকিরগঞ্জের হাটের বড় বটগাছটা দেখা যায়। পথ দিয়ে নানা রকমের লোক যাওয়া-আসা করছে। কেউ বেসাতি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ সওদা নিয়ে ফিরছে, কেউ সওদা করতে চলেছে।

হাটটা লালুর চেনা, সে অনেক বার হাটে এসেছে। হাটের মুখেই সার্কাস হচ্ছিল, এক পয়সার খেলা। ছোট তাঁবু। কয়েকটি মুসলমান তার বাইরে দাঁড়িয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে

বাজাতে চীৎকার ক'রে বলছে—"ভানুমতীর খেল্ এক পয়সা—চ'লে এস।"

তাদের একজন একটা টুপির ভিতর থেকে মুঠো মুঠো কাগজের সরু ফালি বা'র ক'রে চিবোচ্ছে; আর বলছে—"নাস্তা, নাস্তা!" ব'লেই মুখের ভিতর থেকে একটা কাগজের ভেঁপু টেনে বা'র করছে।

লালুর ইচ্ছে করতে লাগল, সে এক পয়সা দিয়ে ভিতরে যায়। একটা টাকা ত আছে। সে ট্যাঁকে হাত দিয়ে টাকাটা বা'র করতে গিয়েই চমকে উঠল। টাকা কোথায় গেল? এ ট্যাঁকে কি? না, এ ট্যাঁকেও ত নেই। পকেটে রেখেছে কি? সে তিনটে পকেটই হাঁতড়ে দেখলে। না, নেই ত! তার বেশ মনে হচ্ছে কাকীমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে গুঁজলে ট্যাঁকে। ট্যাঁকেই রেখেছিল, ট্যাঁক ছাড়া সে কোথাও রাখে নি। সে আবার ট্যাঁক দুটো ও সেই সঙ্গে জামার পকেট তিনটে খুঁজলে।

ভয়ে তার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কি দিয়ে সে হাট করবে? খুড়োমশায় শুনলে রক্ষা থাকবে না; বলবেন, "একটা টাকা রোজগার করতে ক' ফোঁটা রক্ত জল হয় জান?" টাকাটা সে কোথায় পাবে? পথে পড়েছে কি? পড়লেও ত পাওয়া যাবে না। তার চোখে জল এল।

সে খালুই সুদ্ধ হাত দুখানা পিছনে দিয়ে টাকাটা পথের চার ধারে খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে চলল।

পথে কেবল ধুলো, গোবর ও শুকনো কাঁটানটের গাছ। সাদা জিনিস চোখে পড়লেই তার বুকটা নেচে উঠে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে, সেটা শামুকের ভাঙ্গা খোলা। তার বুকটা আবার দমে' যায়। একটা টাকা সে কোথায় পাবে? কি ক'রে টাকাটা হারাল? নিশ্চয়ই পথে কোথাও প'ড়ে গেছে। খুড়োমশায় বলবেন, "তুমি অসাবধান।" তারপরই বেত পড়বে। তার জন্যে একখানা বেত তোলা আছে। আবার তার চোখে জল এল। কি করবে সে? সে ত ইচ্ছে ক'রে হারায় নি। চট্ ক'রে তার মনে পড়ল মাসীমা ত এবারও যাবার সময় তাকে একটা টাকা দিয়ে যাবেন। এখন যদি একটা টাকা ধার পায় ত সেই টাকা দিয়ে ধার শোধ দেবে।

সে ঘাড় তুলতেই দেখে তার সামনে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি খুঁজছ? হাটে যাও নি?"

লালু ঢোক গিলে বললে—"না স্যার, আমার টাকাটা—"

—"হারিয়েছ? হারাবারই কথা। তোমার মত চঞ্চলমতি বালকেরাই অসাবধান হয়। সম্ভবতঃ খেয়াঘাটেই তোমার টাকাটি হারিয়ে থাকবে। কোথায় রেখেছিলে?"

-"টঁ্যাকে—"

—"না পকেটে? পকেটে টাকা রাখলেই হারায়। সেই যখন লাফিয়েছিলে তখনই প'ড়ে গেছে। দেখ, তোমার দোষেই এরকম ক্ষতি হ'ল। বাড়ীতে কতখানি অসুবিধার কারণ হবে বুঝতে পারছ?"



লালুর চোখ ছুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠল; বললে—"স্যার, আমাকে একটা টাকা ধার দেন; কাল ইস্কুলে শোধ দেব।"

পণ্ডিতমশায় প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন; তারপর বললেন—"দেখ, আমি দিতে পারি। তবে কিনা, টাকাটি

আমার নয়। তোমারই খুড়োমশায়ের টাকা। আমি কাল কলকাতা যাব। তিনি একটা ওষুধ কিনতে আমাকে কয়েকটি টাকা দিয়েছেন। আমি তাই থেকে তোমায় দিচ্ছি"— বলতে বলতে তিনি পেটের উপরের কোঁচাটা খুললেন। লালু দেখলে, তার খুঁটে জড়িয়ে বাঁধা একখানি ময়লা রুমাল। রুমালের খুঁটে বাঁধা একখানি পাঁচ টাকার নোট, কয়েকটি টাকা ও রেজ্‌গি। তিনি তাই থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে বললেন—"দেখো বাবা, আমাকে অপদস্থ ক'রো না।"

টাকাটা নিতে লালুর বুক কেঁপে উঠল। তার খুড়োমশায়ের টাকা! কিন্তু সে ত দিয়ে দেবে। মাসীমার কাছ থেকে আজ রাতের বেলায়ই সে চাইবে। মাসীমা তাকে ভালবাসেন, সেবার সঙ্গেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে টাকাটা হাতে নিয়ে বললে—"স্যার, টাকাটা আমি ঠিক কাল দেব। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, খুড়োমশায়কে বলবেন না।"

—"সে বিবেচনা করা যাবে। আজ যে শিক্ষা লাভ করলে, কখনও ভুলো না। সর্ব্বদা ধীর ও সাবধান হবে।"

"হ্যাঁ স্যার" ব'লেই লালু হাটের দিকে ছুটল। কিন্তু সে মনে আর স্ফূর্ত্তি পেল না।

মস্ত হাট। কোথাও কাপড় গামছা সুতো, কোথাও মাছ, কোথাও মুড়ি চিড়ে গুড় বাতাসা জিলাপী, কোথাও মাদুর-

চাটাই, টিন, চিটেগুড় বিক্রী হচ্ছে। তরি-তরকারিও এসেছে নানা রকম। হাটের ধারে ধারে দোকান-পসার—পান, মসলা-পাতি, টিনের ছোট আয়না, ঘুনসী, কাঁকই এমনিতর নানা জিনিসের। ওদিকে গোহাটা ; তার এধারে কতকগুলো গরুর গাড়ী প'ড়ে আছে। কোথাও মুরগী ও ছাগলের হাট বসেছে। কোথাও ভিখারীর দল নানান সুরে চীৎকার করছে। কোথাও বা ব্যাপারিতে ব্যাপারিতে এক গাদা খালি বস্তা সামনে রেখে তুমুল বচসা করছে। চারধারে ঠেলাঠেলি, চীৎকার, গোলমাল। লালু খালুই ছটো হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তার খালুই ভর্ত্তি সওদা। মাছটা বেশ বড়, ওজনে সের ছুই হবে। খুড়ীমা যা যা বলেছিলেন, সবই সে কিনেছে। কিনেও বেঁচেছে সাড়ে তেরো পয়সা।

সে একবার ভাবলে, পয়সাগুলো পণ্ডিতমশায়কে ফেরত দেয়। তারপরই মনে পড়ল, খুড়ীমার কাছে হিসাব দেবার সময়ে ধরা পড়বে। সে টাকা হারানোর কথা কাউকে বলবে না, এক মাসীমা ছাড়া।

হাটের বাইরে এসে পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে খালুই ছটো ছ'হাতে তুলে সে ফিরে চলল।

বেলা প'ড়ে এসেছে, নদীর জলে কালো ছায়া। মাথার উপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে; পাড়ের গায়ে গাঙশালিখেরা কিচির-মিচির করছে। অনেকেই হাট থেকে ফিরছিল। সামনে একখানি খালি গরুর গাড়ী ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছিল। খালুই দুটো ভারী; লালু একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গাড়ীখানার পিছনে পৌঁছে খালুই দুটো তার উপর রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলল। গাড়োয়ানের খেয়াল নেই, সে তার পিছনে যে লোকটা বসেছিল, তার সঙ্গে গল্পে মশগুল। গত বছর কোন্ কোন্ গাঁয়ে সে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, কত টাকা রোজগার' করেছিল, তাই নিয়ে আলোচনা করছে।

চলতে চলতে খেয়াঘাট দেখা দিল। দু'চারজন নৌকোয় উঠে বসেছে, কেউ কেউ উঠছে। এবার লালুর ভয় হ'ল। যদি মাসীমা না আসে? সে যত ঠাকুর-দেবতার নাম জানত সকলকে মনে মনে ডাকতে লাগল। খেয়া ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় সে গিয়ে খেয়ায় উঠল। এবার সে চুপচাপ ব'সে আছে। খেয়াটাতে যাত্রী ও বস্তা, হাঁড়ি, মাছ, পান প্রভৃতি জিনিস-পত্রে ঠাসাঠাসি। একজন দুটো পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। পাঁঠা দুটো মাঝে মাঝে "ম্যা-ম্যা" করছে।

খেয়া যত কূলের কাছে আসে লালুর ততই ভয় করে। কিন্তু ঐ যে একখানা ডিঙি খেয়াঘাটের এধারে কূলে বাঁধা।

মাঝিরা রান্নার যোগাড় করছে। একজন মশলা বাঁটছে। ঐ ডিঙিতেই বোধ হয়…একবার সে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে।

খেয়া আবার অঘাটায় গিয়ে পড়ল। দাঁড় টেনে ডিঙির পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাটনী জিজ্ঞাসা করলে—"কোথাকার ডিঙি গো?

মাঝি উত্তর দিলে—"কালীডাঙার।"

—"যাবে কোথা?"

—"মহেশপুর।"

—"ওঃ?"

—"মহেশপুর।"

—"এখানে যে?"

—"সওয়ারী ছিল।"

লালুর মন আনন্দে নাচছে—মাসীমা এসেছে। পণ্ডিত মশায়ের টাকা সে কাল ইস্কুলে গিয়েই দিয়ে দেবে।

তখন সন্ধ্যা লাগে-লাগে। খুড়োমশায় আসেন নি। তিনি আসবেন রাত্রে।

লালু বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই দেখে সামনে খুড়ীমা। তিনি তাকে দেখে ব'লে উঠলেন—"কিরে! বাড়ী এলি যে?"

লালুর বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। সে খালুই ছুটো মাটিতে নামাল।

খুড়ীমা বললেন—"এসব কিনলি কি দিয়ে ?"

লালু অবাক হয়ে গেল। তার টাকা হারানোর কথা খুড়ীমা জানলেন কি ক'রে ? পণ্ডিতমশায় ত ফেরেন নি। সে আসবার সময় তাঁকে শ্রীনিবাস সা'র দোকানে ব'সে তামাক খেতে দেখেছে ; বললে—"টাকা দিয়ে।"

—"টাকা পেলি কোথায় ?"

—"তুমি দিয়েছিলে—"

—"আমি ত দিয়েছিলাম। তুই নিয়েছিলি ?"

—"হাঁ।"

—"ফের মিছে কথা ?"

গোলমাল শুনে মাসীমা সেখানে এলেন। তাঁর কোলে একটি মোটা-সোটা ছেলে। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে ?"

লালু মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তাঁকে যেন একটু অচেনা ঠেকছে। তিনি যেন ঠিক সেই মাসীমা নন। মাসীমা এর আগে যখন এসেছিলেন তখন খোকা হয় নি।

খুড়ীমা বললেন—"আমি ওকে বাজারের টাকা দিয়েছি। উনি টাকাটি ঐ ছেঁচতলায় রেখে ঘুড়ি-লাটাই ঘরে তুলে খালুই নিয়ে হাটে গেছেন। ...টাকা পেলি কোথায় বল্ ?"

—"সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে ধার করেছি।"

মাসীমা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন—"ও বাবা! সেই নেলো এমন হয়েছে।"

খুড়ীমা বললেন—"দেখলে ত! দাঁড়াও আসুন আজ।" বলতে বলতে তিনি খালুই ছুটো হাতে তুলে নিলেন।

লালু চট্‌ ক'রে তার খুড়ীমার পায়ের উপর প'ড়ে বললে— "তোমার পায়ে পড়ি কাকীমা, তুমি কাকাকে ব'লো না। আমি এবার থেকে খুব সাবধান হব।'



—"আচ্ছা, ছাড়, পা ছাড়। মনে থাকে যেন।"

লালু ঘাড় নেড়ে বললে—"থাকবে।"

মাসীমা বললেন—"ছোঁড়া এতও জানে—"

খুড়ীমা একথার কোন জবাব দিলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন—"কত ফিরেছে ?"

—"সাড়ে তেরো পয়সা।"

—"কাল ইস্কুলে গিয়ে টাকাটা পণ্ডিতমশায়কে ফেরত দিবি। বাকী পয়সাগুলো তোর মাসীর হাতে দে।"

লালুর বুকের ভার সব নেমে গেল। তার মনে পড়ল মাসীমাকে প্রণাম করা হয় নি। সে টপ্ ক'রে তার মাসীমাব পায়ে প্রণাম করতেই মাসীমা বললেন—"হয়েছে—হয়েছে। তোর সুবুদ্ধি হোক।"

মাসীমার আশীর্ব্বাদটা খচ্ ক'রে লালুর বুকে বিঁধল। কেউ তাকে ভালবাসে না।

যা'হোক, সন্ধ্যা ও পরের সকালটা মাসীমার ছেলেকে নিয়ে তার বেশ আনন্দেই কাটল। খুড়ীমা খুড়োমশায়ের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন না।

মাসীমা সেইদিন বিকালেই চ'লে যাবেন। ইস্কুলে যাবার সময় লালু বার বার ক'রে বললে—"মাসীমা, আমি না ফিরলে যেও না।" মাসীমা এই অনুরোধের উত্তরে শুধু একটু হাসলেন। খুড়ীমা তাকে টাকাটা চুপি চুপি দিয়ে বললেন—"নিয়ে যা।"

লালু লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে চ'লে গেল। আজ বিকালে সে মাসীমার কাছে একটা টাকা পাবে।

বিকালে ইস্কুল থেকে ফিরে সে দেখে নিতাই মাসীমাদের বিছানা ও ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। মাসীমা ও মেসোমশাই বা'র-উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খুড়োমশায় ও খুড়ীমা।

মাসীমা লালুকে বললেন—"তুই আর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে কি করবি ?" বলতে বলতে আঁচলের গেরো খুলতে লাগলেন।

লালু আনন্দে মাসীমা ও মেসোমশায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাসীমা বললেন—"এই নে।"

লালু দেখলে, দুটো পয়সা। সে ছুটে ভিতরে চ'লে গেল। মাসীমা চীৎকার ক'রে বললেন—"নিয়ে যা রে, নিয়ে যা—লজ্জা হয়েছে !···আচ্ছা, দিদি, তুমিই ওর পয়সা দুটো রাখ।"

লালুর দু'চোখে জল। সে ঘরে গিয়ে বইগুলো কেরোসিন কাঠের সেল্‌ফের উপর রেখে, ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঘুড়িখানা পেড়ে নিয়ে, তার লেজটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল।

তারপর একবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলে—শেষ-বেলার রৌদ্রমাখানো ধান-ক্ষেতের আল দিয়ে ঐ মাসীমারা চলেছেন নদীর দিকে।



সুশান্ত ও শিউনন্দন

শরতের সোনালী রৌদ্রে আকাশ, মেঘ ও ধরণী হয়ে উঠেছে সোনার মত উজ্জ্বল—

ট্রেনখানা বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে এসে থামল। যাত্রিদল চঞ্চল হয়ে উঠল। শতকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"জয় বিন্ধ্যবাসিনী।"

যাত্রীরা নামছে। তাদের পিঠে বোঝা, হাতে লাঠি, মনে দুঃখ ও ভক্তি। বহুদূর থেকে তা'রা এগুলোকে ব'য়ে আনছে; শেষের দুটিকে দেবীর চরণে নিবেদন করবে।

সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকেও নামলেন একদল যাত্রী। সংখ্যায় তাঁরা ছ'জন। তাঁরাও এসেছেন তীর্থে—দেবী ও দৃশ্য দর্শনে। মনে বেদনা ও ভক্তি যদি কিছু থাকে তাও সাড়ম্বরে সকলকেই যাবেন জানিয়ে।

তাঁদের পোষাকের বিজাতীয়তা, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা মলিনবেশ যাত্রীদের থেকে তাঁদের ক'রে দিয়েছিল স্বতন্ত্র। তাঁদের মুখে প্রফুল্লতা ও দাম্ভিকতা; ঠোঁট যেন অবজ্ঞায় একটু বাঁকা।

তাঁদের মধ্যে যিনি প্রৌঢ় তিনি ব'লে উঠলেন—"চল, আগে পাহাড়টা দেখে আসা যাক্—"

সঙ্গে দু'জন মহিলা ছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা—আধা-ইচ্ছা—আগে গ্রামে গিয়ে দেখে আসবেন—বিন্ধ্যবাসিনীকে।

দুটি ছোট ছেলে-মেয়েও ছিল সঙ্গে। মেয়েটির বয়স হবে আট বছর, ছেলেটির হবে বছর বারো। পেট ভ'রে ভাল সামগ্রী খেতে পায়; সেইজন্যে তাদের শরীর বেশ পুষ্ট, মুখেও রয়েছে শ্রী। তা'রা দু'জনেই ধ'রে বসল—"চল, পাহাড়ে।"

—"হাঁ; মিঃ রায়, চলুন আগে পিক্‌নিক ক'রে আসা যাক। তারপর—" ব'লে মিঃ দত্ত মেয়েটির হাত ধ'রে এন্‌জিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পাশে দাঁড়িয়েছিল ভৃত্য ও দ্বারবান। বাকী সকলে মিঃ দত্তকে অনুসরণ করলে তাঁরাও পিছন পিছন চলতে লাগল লাঠি-সোঁটা ইত্যাদি নিয়ে।

প্ল্যাটফরমের দক্ষিণে রেললাইনের পারে মাঠের উপর দিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের দিকে পায়ে-চলা পথ, বামে তারের বেড়ার পর পাকা রাস্তা। সেটা পার হ'লে বাজরা-ক্ষেত। তার মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ চ'লে গেছে পাহাড়ের দিকে।



সকলে তারের বেড়া ডিঙোতেই সামনে হাত পেতে দাঁড়াল এক মলিন-মূর্ত্তি কিশোর। সে একেবারে চাইল—একটা

আনি। তারপর পেটে হাত দিয়ে মুখখানা সঙ্কুচিত ক'রে বলল,—"বড়ি ভুখ্।"

মেয়েটি—নাম বকুল—রাজপুতানার লক্ষ্মণ সিংহের গল্প শুনেছিল ; সে ব'লে উঠল—"ম্যয় ভুখা হুঁ!"

সঙ্গে সঙ্গে উঠল হাসির রোল।

মিঃ রায় বললেন—"ভাগো।"

ভিখারী ছেলেটি কিন্তু ভাগল না, তাঁদের পাশে পাশে যেতে লাগল, আর হাত পেতে বলতে লাগল,—"বাবু, একঠো আনি—"

মিঃ দত্ত বললেন—"র‍্যাস্‌কেলটার 'অ্যাম্‌বিশান' উঁচু!... যাও!" তিনি হাতের বেতের মোটা লাঠিখানা তুললেন।

তবুও ছেলেটির ভাবান্তর দেখা গেল না ; ভিক্ষা চাওয়ার পর হুঙ্কার ও ভর্ৎসনালাভেও সে হয়ে গেছে অভ্যস্ত। বলল—"দাও বাবু!"

মিঃ রায় লক্ষ্য করলেন, ছোঁড়াটার গায়ের রং কালো, পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, মাথার পিছন দিকে রয়েছে লম্বা টিকি, কিন্তু তার দাঁতগুলো পালিশ-করা হাতীর দাঁতের মত ঝক্‌ঝকে। সে একেবারে তাঁর পাশে স'রে এল।

তিনি বললেন—"এই স'রে যা—"

ছেলেটা আর কিছু বললে না। সরু পথ। সকলে 'ফাইলে' চলেছে। সে গতি শিথিল ক'রে মিঃ রায়ের পিছনে

তাঁর ছেলেটির পাশে পাশে হাত ছুলিয়ে চলতে লাগল, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাঁর দিকে লাগল তাকাতে।

সম্মুখে শস্যশূন্য রুক্ষ মাঠ। পথটা গেছে তার উপর দিয়ে। মাঠের ওপারে দেখা যাচ্ছে বিন্ধ্যাচল—শ্রী নেই, শোভা নেই, গাম্ভীর্য্যহীন খানিকটা উঁচু জায়গা পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আছে—যেন একটা অধিত্যকা। তার উপর দেখা যাচ্ছে খান কয়েক সাদা রঙের বাড়ী।

সকলে পথ পেরিয়ে, তারপর বুনো গাছের ছায়াঢাকা পথ দিয়ে পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলেন।

মিঃ রায়ের ছেলে সুশান্ত, ভিখারীটাকে জিজ্ঞাসা করল—"এখানে বাঘ নেই ?"

সে ঘাড় নেড়ে বললে—"না।"

—"ভাল্লুক ?"

—"না।"

—"হনুমান ?"

—"না।"

"তবে কি আছে ?"

—"আছে 'মন্দিল—গোপালজী—অষ্টভুজা—খোকাবাবু, বড়ি ভুখ।"

—"তবে বাড়ী যা।"

—"ঘর দূর আছে।"

—"কতদূর?"

সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—"চুনার!"

—"চুনার! চুনার থেকে তুই এত দূরে এসেছিস্? বাড়ীতে কে আছে?"

—"কৈ নেই।"

—"মাও নেই, বাবাও নেই?"

—"না।"

মিঃ রায় ব'লে উঠলেন—"খোকা, ওরা মিছে কথা বলে। সব আছে—ঐ কথা ব'লে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়।···এই ভাগো শূয়ার!"

মিঃ রায়ের বড় বড চোখ দুটো হয়ে উঠল আরও বড়। তাতে দেখা দিল—ঘৃণা ও ক্রোধের আলো।

ছেলেটারও চোখ দুটো চক্-চক্ করছে। সে একবার ঢোক গিললে, তার শুকনো ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে উঠল।

সুশান্ত বললে—"তুই ঝুটা বলছিস্?"

"নেহি।"—ব'লে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর বাঁ-ধারে একটা ছোট গাছের কাছে গিয়ে লম্বা ও চওড়া পাতাওয়ালা একটা ডাল ভেঙ্গে নিলে।

যাত্রীরা চলেছেন। পাহাড়ের কাছে পৌছতেই তাঁরা শুনতে পেলেন কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। ঐ দেখা যায়,

পাহাড়ের কোলে একটা মন্দির। আকাশপানে উঠেছে তার উঁচু চূড়া। দক্ষিণে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। গুহার মুখ ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ। তিনধারে পাথর সাজিয়ে প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে। রৌদ্র ততক্ষণে প্রখর হয়ে উঠেছে—গায়ে বিঁধছে, গলা শুকিয়ে আসছে। গুহাটার একধারে পাথরের উপর থেকে ঝুলছে ছ'খানি চীর। গুহাবাসী সে ছটি নিশ্চয়ই রৌদ্রে দিয়েছে শুকোতে।

বামে দেখা যাচ্ছে এক আশ্রম, গাছপালার ছায়ায় ঢাকা।

মিঃ দত্ত ব'লে উঠলেন—"এসব কি সত্যিকারের সাধু?"

মিঃ রায় হাসলেন একটু ব্যঙ্গের হাসি ; তারপর বললেন—"আসলই হোক নকলই হোক, আমরা কিন্তু আর কোথায়ও না গিয়ে সোজা উঠব পাহাড়ে। কিন্তু পথ কৈ? সে ছোঁড়াটা গেল কোথায়? এই দারোয়ান, তুমি পথ জান?"

—"না, হুজুর!"

—"তবে?"

মিঃ দত্ত বললেন—"চলুন তো। ঐ যে মন্দিরের সামনে কতকগুলো লোক—"

পথটা মন্দিরের সামনে দিয়ে পাশে গিয়ে পিছনে ঘুরে এসে সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায়। নীচে থেকে উপর অবধি রয়েছে সিঁড়ি।…

উপরে উঠতেই শ্রান্ত ললাটে লাগল মৃদু বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ। এক রকম বাবলা-জাতীয় গাছে ফুল ফুটেছিল ছোট ছোট ও অজস্র। তাদের মিঠে মোলায়েম গন্ধে বাতাস ভরা। চোখে পড়ল প্রস্তরময় এক বিশাল প্রান্তর। বামে দূরে কুয়াসা-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড; সেগুলোর মাথায় বন। গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, ধরণী যেন শিউরে উঠেছে। দক্ষিণেও গাঢ় শ্যামলিমার বিস্তার। পিছনে শূন্যতা। সম্মুখের দিকটা ক্রমে হয়ে গেছে ঢালু।

যাত্রীরা চলতে লাগল সম্মুখে একটা মন্দিরের দিকে।

সুশান্ত ফিরে দেখল, আবার সেই ভিখারী ছেলেটা ফিরে এসেছে। তার হাতে একটা পাতার মুকুট। সে সুশান্তর দিকে মুকুটটা বাড়িয়ে ধরল।

সুশান্তর মা হেসে বললেন—"ছোঁড়াটা চালাক। জানে এমনি পয়সা দেবে না; তাই মুকুট তৈরী ক'রে এনেছে।"

সুশান্ত মুকুটটা তার হাত থেকে নিয়ে মাথায় পরল; তারপর মিঃ রায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—"বাবা, এই দেখ লরেল-পাতার মুকুট।"

—"বাঃ! কে দিলে?"

—"ঐ।"

—"আবার এসেছে? স্কাউণ্ড্রেল!"



ভূশান্তর দিকে মুকুটটা বাড়িয়ে ধরল

—"বাবা, ওকে একটা পয়সা—"

—"এই, পয়সাটা নিয়ে ভাগ্। আবার আসবি তো—" ব'লে তিনি ঘুষি দেখালেন।

দাদার মাথায় মুকুট। বকুল বায়না ধরলে—"আমি চাই।"

"একটা মুকুটের দাম এক পয়সা তা জান?"—ব'লে মিঃ রায় হেসে উঠলেন।

ছোঁড়াটা পয়সা নিয়ে তাঁদের আগে আগে ছুটছিল।

দ্বারবান ও ভৃত্য হাঁকলে—"হে লেউন্ডা—"

সে ফিরে দাঁড়াল।

তা'রা দুজনে হাতছানিতে তাকে ডাকতে লাগল।

সেও এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে এলে মিঃ রায় বললেন—"আর একটা তৈরী ক'রে দে—এই খুকীর জন্যে—"

ছেলেটা দেখল বকুলের মুখখানা কাঁদো-কাঁদো। সে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে বলল—"পাতা আছে পাহাড়ের নীচে—"

—"নিয়ে এস, পয়সা দেব।"

সে দাঁড়িয়ে কি যেন একটু ভাবল; তারপর আবার সামনের দিকে দিল ছুট্।

মিঃ রায় ব'লে উঠলেন—"শয়তান!...খোকা, তোমার মুকুটটা বোনকে দাও—"

—"ওটা আমি চাই না—" ব'লে বকুল কাঁদতে লাগল।

—"চুপ করো। তোমাকে সত্যিকারের মুকুট কিনে দেব—দামী মুকুট—ও তো পাতার।"

কিন্তু তখন সেই তুচ্ছ বুনোপাতার মুকুটটাই হয়ে উঠেছে তার কাছে রাজার রত্ন-মুকুটের চেয়েও দামী।...

সকলে মন্দিরটার কাছে পৌঁছে দেখলেন, ছোঁড়াটা সামনের কুয়োটার ধারে একখানা শালপাতা ফেলে দিয়ে জল পান করতে বসল। সামনে দোকানে জিলাপী ভাজা হচ্ছে। তার গন্ধ আসছে। তারপর এক লাফে পাড় থেকে নেমে সে এক দিকে দিল ছুট্।...

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। প্রকাণ্ড বটগাছটার শীতল ছায়ায় সকলে কাঁচা শালপাতায় খিচুড়ি সামনে নিয়ে বসেছেন। মাটির পাত্রে রয়েছে কুয়োর শীতল জল। বাতাস বইছে ঠাণ্ডা। পেটে ক্ষিদে।

বকুল হঠাৎ ব'লে উঠল—"ঐ যে এসেছে—ঐ যে মুকুট রয়েছে ওর হাতে—দে—দে" বলতে বলতে ছেলেটার দিকে সে ছুটে গেল। কারও বাধা-নিষেধ সে মানল না।

ভাই-বোনে মুকুট মাথায় দিয়ে খাচ্ছে।

ভিখারী ছেলেটা ব'সে আছে কিছু দূরে কুকুরের মত। মাঝে মাঝে সে পাতের ও গ্রাসশুদ্ধ হাতটা যখন মুখে উঠছে তার দিকে তাকাচ্ছে। তার দু' চোখে ক্ষিদে; সে এক একবার

ঠোঁট চাটছে। মিসেস্ দত্ত তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

সুশান্তর মা ব'লে উঠলেন—"এই, স'রে যা ওখান থেকে।...কি রকম ক'রে তাকাচ্ছে দেখ।"

ছোঁড়াটা সরলে না, ফিরে বসলে মাত্র—সে যেন কি বলতে চায়। কি যেন তাকে সেখানে চেপে ধ'রে রেখেছে।

মিঃ দত্ত পকেট হাঁতড়ে একটা পয়সা বা'র ক'রে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—"এই নে।"

সে পিছন ফিরে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে এক পা এক পা ক'রে স'রে যেতে লাগল।

খাদ্যটি হয়েছিল অমৃতসমান। তবুও হাঁড়িতে কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেল।

সুশান্ত বললে—"মা, ছেলেটাকে দাও না—"

—"ও হতভাগা তো এই জন্যেই ঘুর-ঘুর করছে। কৈ সে?"

—"ঐ যে। এই—আয়—শুনে যা।"

সে কাছে আসতে সুশান্ত বললে—"আমার মা তোকে খিচুড়ি দেবে, খাবি?"

সে খিচুড়ির হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে ঘাড় নেড়ে জানালে, "হাঁ!"...

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে। তাঁদের ফিরবার গাড়ী রাত্রে। তখন বেলা সবে দুটো। পাঁচটার সময় পাহাড় থেকে নামলেই হবে। এখন একটু ঘুরে-ফিরে দেখা যাক।

দ্বারবান ও ভৃত্যের দেখবার আগ্রহ ছিল না। তা'রা মন্দিরের বারান্দায় গামছা বিছিয়ে 'নিদ্' দেবার যোগাড় করতে লাগল। 'পাহাড়-জঙ্গল' তা'রা কি দেখবে? 'মুল্লুকমে বহুৎ' আছে।

মহিলারা বটের বাঁধানো গোড়াটায় ছায়ায় শুয়ে ক্লান্তি দূর করতে লাগলেন। বকুলও রইল সেখানে। গাছের ডালে পাতার আড়ালে শিষ দিচ্ছে টুনটুনি ও বুলবুল; খাদ্যের খোঁজে ছুটছে কাঠবেড়ালী। এক একবার উঠছে ডেকে। বুলবুলের শিষ, কাঠবেড়ালীর ডাক ও পাতার মর্ম্মর একসঙ্গে মিশে শোনাচ্ছে চাপা গানের সুরের মত।

মিঃ রায় ও মিঃ দত্ত চলেছেন চুরুট টানতে টানতে।

সুশান্ত ও ভিখারী ছেলেটা বটগাছটার কাছ থেকে কিছু দূরে পাথরের পুকুরটার ওপারে একটা পলাশগাছের ছায়ায় ব'সে গল্প করছে।

আকাশের নীলসাগরে সাদা রাজহাঁসের সারির মত মেঘগুলো যেন ডানায় মুখ লুকিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে ভাসছে। নীচে পড়েছে তাদের ছায়া। বাতাসও যেন তন্দ্রাভরে হয়েছে আরও

অলস। দূরে—নীচে—শ্যামল বনের শেষে শুকনো সাদা বালুপ্রান্তরের মধ্যে যেন নিশ্চল হয়ে আছে গঙ্গার ধারাটি—নীল, বাঁকা। তার বুকে ভাসছে সাদা পাল তুলে দু'খানি ছোট নৌকো। মিঃ রায়েরা চলেছেন ওই দৃশ্যের দিকে।...



সুশান্ত ছেলেটাকে বললে—"সত্যি কেউ নেই তোর?"

—"কৈ নেই।"

—"তোকে কে খেতে দেয়?"

—"সব দিন খাই না।"

—"খাস্ না। রাত্রে কোথায় থাকিস্?"

—"ঐ টিশনে— না হয় মন্দিলে।

"শীতকালে ?"

—"আগুনের পাশে।"

—"কোথায় আগুন পাস্ ?"

—"যেখানে হয়।"

সুশান্ত চুপ ক'রে রইল। তার সামনে নীল কুয়াসায় ঢাকা পাহাড় ও বন। সে জিজ্ঞাসা করল—"এই পাহাড়টার পর কি আছে ?"

—"জঙ্গল।"

—"সেখানে যাওয়া যায় ?"

—"হাঁ, রাস্তা আছে। কাঠুরিয়ারা যায়।"

—"তুই আমায় নিয়ে যাবি ?"

সে সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

—"হাসলি যে ?"

—"তোমার ডর লাগবে।"

—"ডর ? হোঃ! বলে কি ? জানিস্—নেল্‌সন···তুই মুখ্যু।···তোর নাম কি ?"

—"শিউনন্দন।" ব'লে ছেলেটা বেয়াকুবের মত হাসতে লাগল।

—"ঐ জঙ্গলে বাঘ আছে ?" বলল সুশান্ত।

—"কখন কখন আসে। তোমার ঘর কোথায় ?"

—"কলকাতা; খুব বড় শহর।" সুশান্ত দেশের গল্প ফেঁদে বসল।

ছেলেটা হাঁ ক'রে শুনতে শুনতে হঠাৎ ব'লে উঠল—"পিয়াস লাগলো।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কূয়োর দিকে দিলে ছুট্।

বেলা পাঁচটা। সারাদিনের রৌদ্রে জমাট ছায়া যেন তরল হয়ে মাটির উপর গড়িয়ে গড়িয়ে গেছে। গঙ্গাপারে সূর্য্য বসেছে পাটে।

যাত্রীরা যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সুশান্ত কৈ?

সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাছে সব জায়গায় খুঁজে দেখা হ'ল—সে নেই। মিঃ রায়েরা দু'জনে যেদিকে অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়েছিলেন, সেদিকে সে যায় নি; গেলে দেখা হ'ত। তবে?

দ্বারবান ও ভৃত্য ছুটল পূব-পশ্চিমে, মিঃ রায় ও মিঃ দত্ত চললেন দক্ষিণে।

তারপর পুরো একটি ঘণ্টা কেটে গেল। তাঁরা চারজনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন;—সুশান্ত নেই।

তার মা বললেন—"সে পাহাড়ের নীচে গ্রামে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে যায় নি তো?"

—"না; তেমন কোন লক্ষণ—" বলতে বলতে মিঃ রায় চিন্তার মাঝে তলিয়ে গেলেন।

মিঃ দত্ত বললেন—"সে ছোঁড়াটাই বা কোথায় ?"

বকুল ব'লে উঠল—"ঐ যে ব'সে আছে—"

তাঁরা দেখলেন, ভিখারী ছেলেটা মন্দিরের পাশে কয়েকটা খোট্টা যাত্রীর কাছে উবু হয়ে ব'সে আছে।

এদিকে সব কিছুর গায়ে একটু একটু ক'রে সন্ধ্যা ছায়া মাখিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ রায় ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হাতছানিতে তাকে ডাকলেন—"এই শোন্—শোন্ জলদি—"

ছেলেটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

মিঃ রায়ের ততটুকু দেরীও সইল না ; তিনি এগিয়ে যেতে যেতে ব্যাকুলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"সেই খোকাবাবুকে দেখেছিস্ ? সেই যাকে মুকুট দিয়েছিলি ?"

মিঃ দত্ত এগিয়ে এসে বললেন—"তাকে যদি খুঁজে আনতে পারিস্—"

"বখশিষ দেব।"—বললেন মিঃ রায়।

কিন্তু ছেলেটার বখশিষের প্রতি লোভ দেখা গেল না, সে বলল—"এই পাহাড়-জঙ্গলমে কাঁহা—"

সেদিন শারদসপ্তমী। সন্ধ্যা তার কোমল আঁচল দিয়ে চাঁদখানিকে মুছিয়ে দিল। জ্যোৎস্না উঠল চিক্-চিক্ ক'রে,

গাছের পাতায় পড়ল ঝ'রে, সেখান থেকে পড়ল মাটিতে গলা-রূপোর মত।

মিঃ রায় ব'লে উঠলেন—"এই—যা—যা ; বখশিষ দেব—রূপেয়া—"

ইতিমধ্যে তাঁদের চারধারে ছুটি একটি ক'রে কতকগুলো লোক জড়ো হ'ল।

তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—"তাঁকে মা বিন্ধ্যবাসিনী নিয়েছে। 'পরসালে' এক রাজার 'লড়কা'—"

কথাটা শুনে যাত্রীদের বুকের ভিতর জাগল হাহাকার। দানের চেয়ে গ্রহণের জন্য বিন্ধ্যবাসিনী যে হাত বাড়িয়ে আছেন একথা তাঁদের বিশ্বাস হ'ল সহজেই। আর তাঁর যত লোভ ধনীর দুলালের উপর। দরিদ্র যারা তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে আছেন।

মিঃ রায়ের স্ত্রী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"মা, ফিরিয়ে দাও—জোড়া পাঁঠা দেব—"

মিঃ দত্ত ছুটলেন , দ্বারবান, ভৃত্যও আবার ছুটল। দূর থেকে তাঁদের ডাক ভেসে আসতে লাগল—"সু-শা-ন্ত-ও-ও !"

একটু রাত হয়েছে। তাঁরা মন্দিরের বারান্দায় ভারাক্রান্ত মনে, অবসন্ন দেহে ব'সে আছেন। মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত দয়াপরবশ হয়ে মনুষ্যজীবনের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন—

"ও পূর্ব্বজন্মে ছিল যোগী। বিন্ধ্যবাসিনীর কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ ক'রে সংসারত্যাগী হয়ে আবার যোগাভ্যাস করতে গেছে। মরে নি—"

মা-বাপের মন! তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন—ছেলের চরিত্রে বৈরাগ্যের, যোগীর কোন লক্ষণ ছিল কি না? হাঁ—হাঁ ছিল। সে প্রায়ই নানা অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য প্রশ্ন করত।

মা ফুলে' ফুলে' কাঁদছেন।

পুরোহিত আবার বললেন—"সাধু তুলসীদাস কহে—"

-"মা!"

সকলে চম্‌কে উঠলেন। তাকিয়ে দেখেন, সামনে বারান্দার ধারে সুশান্ত ও সেই ভিখারী ছেলেটা। তাদের মুখে পড়েছে স্বচ্ছ জ্যোৎস্না।

মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। মিঃ রায়ও আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না; তাঁর মনে উঠেছে আনন্দের ঢেউ।

সকলে ব'লে উঠলেন—"জয় মা বিন্ধ্যবাসিনী।"

কিন্তু মা ও ছেলের দিকে তাকিয়ে ঐ ভিখারী ছেলেটার চোখে ফুটে উঠেছে ও কি ক্ষুধা! তার চোখের মণি, চোখের তারা জ্বলছে। তার ঠোঁট দু'খানা হয়ে গেছে ফাঁক; তার মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতগুলো যাচ্ছে দেখা। সে জিভ দিয়ে ঠোঁট

চাটছে আর মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে—যেন সুমিষ্ট কিসের স্বাদ গ্রহণ করছে।

মিঃ রায় ব'লে উঠলেন—"তুই কোথায় ছিলি ?"

সুশান্ত তখনও একটু একটু হাঁফাচ্ছিল, বললে—"পাহাড়ের নীচেটা দেখতে গিয়ে পথ হারিয়েছিলাম।"

—"কি ভয়ঙ্কর সাহস !"

—"বাবা, ঐ ছেলেটা চেঁচাতে চেঁচাতে নীচে নামছিল। আমিও ওর নাম ধ'রে ডাকলাম—শিউনন্দন ! ও অমনি সাড়া দিল। ওর সঙ্গে ফিরে এলাম। না হ'লে···মা, তুমি আমার জন্যে কাঁদছিলে ?"—

মা উত্তর দিলেন, তার গালে একটা চুমো দিয়ে।

মিঃ রায় বললেন—"চল—এখনও গাড়ীর সময় আছে। আজ আর নীচে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখা হবে না।"

"কিন্তু আমি যে মানৎ করেছি—"

—"ও—কালই সেটা দিতে হবে ?"

—"হাঁ।"

—"আচ্ছা।"

তাঁরা সানন্দে চলতে লাগলেন যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেছিলেন তার বিপরীত দিকে। কিছুদূর গিয়ে বকুল ফিরে বললে—"বাবা, ছোঁড়াটা আবার আসছে—"

—"কে? ওহোঃ—" মিঃ রায় পকেট থেকে একটা চক্‌চকে সিকি বা'র ক'রে বললেন—" এই নে তোর বখশিষ।"



ছেলেটা আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে তার দিকে তাকাল; তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু তার বেশী মিঃ রায়ের দেবার সামর্থ্য নেই!

ছেলেটা ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল মন্দিরেব দিকে। যাত্রীরাও আবার চললেন। কেউ কারো দিকে আর ফিরেও তাকাল না।



দীর্ঘ তিনটি বৎসর চেষ্টার পর একটি চাকরি জুটল—

কর্ম্মস্থল কলকাতা থেকে বেশি দূর নয় ;—পিয়ালী নদীর ধারে এক ইটখোলায়। কর্ম্ম হ'ল কেরানিগিরি ও ইটখোলার খবরদারি।

মালিক থাকেন কলকাতায়। তাঁর নানা কাজ। মাসে দু'-একবার ইটখোলা তদারক করতে যান। বললেন—"কাজেই



সেখানকার যা-কিছু সব করতে হবে তোমাকে ; এমন কি, খরিদদারদের কাছ থেকে কখন কখন টাকা আদায়ও। জায়গা ভাল ; কাজও বেশি নয়।"

বললাম—"খাটতে আমি ভয় পাই না, স্যার।"

—"গোড়ায় ও-কথা সকলেই বলে হে। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই স'রে পড়ে। সেইজন্তেই এদেশের লোকের উন্নতি হয় না।" ব'লে কর্ত্তা এমনভাবে আমার দিকে



তাকালেন, যেন আমিও পালাব। তারপর আবার বললেন—"মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করলে ঐ ইটের পাঁজা তোমার কপালে সোনার পাহাড় হয়ে উঠবে।"



—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তোমার জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে টাকা-পয়সা হাতে নেই। সেখানকার খাওয়া-দাওয়ার খরচ অবশ্য তোমার, আর থাকবার খরচ আমার—ঘরের ভাড়া দিতে হবে না। সরকারের কাছ থেকে আড়াইটে টাকা নাও—ব'লে দিচ্ছি। কাল সকালের গাড়ীতেই রওনা হওয়া চাই।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"...

আমিও কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচি। ব'সে ব'সে দু'বেলা অন্ন ও অন্নদাতার তিরস্কার ভক্ষণের ফলে অজীর্ণতা দেখা দিয়েছিল। দু'-একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বললে—"সে হ'ল বাঘ, কুমীর আর ডাকাতের জায়গা।"

বললাম—"ক্ষতি কি? সাহেবেরা ওর চেয়ে ভীষণ জায়গায় গিয়ে টাকা রোজগার করে।" এ যুক্তির বিরুদ্ধে আর আপত্তি চলে না।

পরদিনই সকালের গাড়ীতে আড়াইটি টাকা সম্বল ক'রে, একটি ছোট টিনের বাক্স ও ছোট একটি বিছানা নিয়ে রওনা হ'লাম এবং বোঝা দুটি পালা ক'রে স্বহস্তে ও স্বস্কন্ধে বয়ে ইটখোলায় যখন পৌঁছলাম বেলা তখন দুপুর।

ছোট নদী। তার ধারে পাঁচ-ছ'টি পাঁজা। সেগুলোর একধারে একখানি খড়ের ঘর। ঘরখানার বেড়া চাটাইয়ের,

ধারি বেশ উঁচু; সামনে হাত দুই চওড়া বারান্দা। বারান্দায় ব'সে দুটি লোক একটি কল্‌কে টানছিল।

আমাকে দেখেই তাদের একজন কলকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চান?"

আমি পরিচয় দিতেই দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে প্রায় একই সঙ্গে ব'লে উঠল—"এই ঘর, যান; আমরাও এই খোলারই লোক।"

বারান্দায় উঠবার জন্যে তিনটি তালের গুঁড়ি পৈঠার মত ক'রে বাঁশ দিয়ে বাঁধা ছিল। তার উপর দিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকে দেখি, একধারে একটি বাঁশের খালি মাচা; তার উপরে বেড়ার গায়ে একটি চৌকো জাফরি-দেওয়া ফোকর বা জানালা। ঠিক তার উল্টো দিকে তেমনই ধরণের আর একটি ফোকর। তার নীচে ছিল একটা কলসী, একটা পোড়া হাঁড়ি ও এক বোঝা কাঠ। সেগুলো থেকে হাত তিনেক দূরে ছিল একটি উনুন।

শরীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আহার্য্য প্রস্তুতের উপায়গুলো দেখে, শরীর যেন আরও ক্লিষ্ট হয়ে পড়ল। মাচার উপর বিছানাটি ও টিনের বাক্সটি রেখে ফিরে দেখি, ঘরের দরজায় সেই লোক দু'জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করছে।

বললাম—"বাপু! একটু জল খাওয়াতে পার?"

তা'রা একগাল হেসে বললে—"হেঁ—হেঁ—জল! জল এখানে কোথা?"

—"কি রকম? ঐ যে নদী—"

—"ওর জল মুখে দিতে পারবেন না—লোণা।"

—"এখানকার লোকে তবে কিসের জল খায়?"

—"কুয়োর, পুকুরের—আর যে-সব জলের নৌকো এই নদী দিয়ে চলে সেগুলোর।"

—"ইটখোলায় কুয়ো নেই?"

—"আছে। কিন্তু আপনার আগে যিনি এখানে ছিলেন তিনি ওর মধ্যে একদিন মরে' ভাসতে ছিলেন।"

আমার গলাটা আরও শুকিয়ে গেল।

একটু সাহস এনে, জোর ক'রে বললাম—"কি ক'রে তিনি মারা গেলেন?"

—"দুষ্ট লোকে খুন করেছিল।"

আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল; বললাম—"কাছে গাঁ কি বাজার ত আছে?"

—"দু'ক্রোশের মধ্যে নেই।"

বহু গল্পে গ্রামের মুদির দোকানে রাত কাটানোর কথা পাঠ করেছি। আশা ছিল, স্বপ্নও ছিল, কিছু না হ'লে অন্তত

মুড়ি-মুড়কি খাব, মুদির দোকানে রাত কাটাব। যে রামায়ণ-মহাভারত কখন পড়ি নি, মুদির মুখে তা শুনতে শুনতে ছারপোকাভরা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু সাবানের ফেনার মত সব হঠাৎ ফেটে শূন্যে মিশিয়ে গেল। বললাম—"এখন উপায়? ঐ কলসীটায় এক কলসী জল—"

—"ওই কলসীতে এখন হাত দেয় কে? এই সাতদিনে ওর মধ্যে সাপে বাসা নিয়েছে। বাদলা এখনও কাটে নি।"

সময়টা শরতের শেষ হ'লেও আকাশ থেকে তখনও মেঘভার দূর হয় নি। সেদিনও পথে আসবার সময় একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। শরীরে আমার শক্তির অভাব নেই; জানতাম, মনও সাহসে ভরা। এই দুই কারণে অসমসাহস প্রকাশের ইচ্ছাও কখন কখন হ'ত এবং তার ক্ষেত্রাভাবে মনে কিঞ্চিৎ খেদও ছিল। কিন্তু সেদিন যেন কেমন হয়ে গেলাম। শক্তি ও সাহস দেখাবার ক্ষেত্রের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই পা দুটো যেন পিছলে যেতে লাগল।

মাচার উপর উঠে পা ঝুলিয়ে ব'সে বললাম—"তোমাদের দেশে এলাম। জল না খেয়ে তোমাদের সামনে শুকিয়ে মরব?"

একজন বললে—"তাই কি আর হয়?"

আলাপটা জমিয়ে তাদের ভিজিয়ে নেবার জন্যে বললাম—"তোমাদের নামটা ত বললে না।"

একজন বললে—"মট্রা।"

অপরজন বললে—"ভূষণো।"

ভূষণো বললে—"এই ঘরে আজ রাতে থাকবেন কি ক'রে?"

—"কেন?"

—"এর দরজার ঝাঁপ নেই। রাতের বেলা কুমীর ঢুকবে।"

—"ঘরে কুমীর ঢুকবে?"

—"হ্যাঁ। সেবার একটাকে খেয়েছিল। রাতের বেলা ওরা জল থেকে উঠে কূলে লুকিয়ে থাকে শেয়াল খাবার জন্যে। মানষের ঘর-দোরেও উঠে যায়—" ব'লে সে আমার সামনে এসে উবু হয়ে বসল। এবার আমার নজর পড়ল তার হাতের বাঁশের লাঠিখানার দিকে;—পেকে লাল হয়ে গেছে।

মট্রা বললে—"যাই, একটু জলের যোগাড় দেখি গে। ভূষণো যাবি?"

ভূষণো উঠবার উপক্রম করতেই বললাম—"ও আসুক; তুমি ততক্ষণ বস।"

মট্রা চ'লে গেল। বাইরে এতক্ষণ রোদ ছিল। হঠাৎ মেঘের আড়ালে সূর্য্য ঢাকা প'ড়ে কেমন একটু অন্ধকার হয়ে

এল। শরীরে আমার যে ক্লান্তি ছিল এবং তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম, কেন জানি না কিছুক্ষণ থেকে তা আর তেমন বুঝতে পারছিলাম না। বললাম—"ভূষণ, তুমি থাক কোথায় ?"

—"এই দিকে।" ব'লে হাত দিয়ে সে আমার মাথার দিকটা দেখিয়ে দিলে।

—"এখান থেকে কতদূর ?"

—"তিন ক্রোশ।"

—"তিন ক্রোশ! খোলা ত বন্ধ। কিন্তু তুমি কেন এখানে এসেছিলে ?"

—"খবর নিতে।"

—"মটূরা কতদূরে জল আনতে গেল ?"

—"ওর কথা বাবু! শালা শয়তানের রাজা। হয়ত আর আসবেই না। এদিকে জল কোথা ?"

বেলা ততক্ষণে আরও প'ড়ে এসেছিল। সেইজন্যে বাইরের ছায়াটা আর একটু ঘোর, ঘরের ছায়া আর একটু কালো হয়ে উঠল।

ভূষণো আবার বললে—"আপনি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন এই বেলা। সঙ্গে টাকা-কড়ি নেই ত ?"

তার চোখের চাহনি যেন আর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছে; লালচে ভাবটাকে মাঝে মাঝে বোধ হচ্ছে—লাল।

বললাম—"না, টাকা-কড়ি কিছু নেই।"

তার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—"যাই বাবু, সন্ধ্যে হয়ে এল। পথ-ঘাট ভাল নয়; ঝড়-জলও আসতে পারে। অন্ধকার রাত। কাল আবার আসব।"

মনে প'ড়ে গেল, সঙ্গে আমার আলো নেই, কেবল আছে একটি ছোট টর্চ। এই জনবিরল নদীতীরে—এই ঘরে, অন্ধকারে কি ক'রে একা রাত্রি কাটাব? বললাম—"ভূষণ, তুমিও আজ এখানে থাক না।"

—"সে হয় না, বাবু। ঘরে আমার কেউ নেই। আমারও ক্ষিদে-তেষ্টা আছে।"

—"মজুর আর কারিগরদের রোজ ত আমার হাতে। তোমার রোজ বাড়িয়ে দেব।"

—"ডবল রোজ ত এখনই আদায় করব।"

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কেন? কিন্তু সহসা বাধা পড়ল। জানালা দিয়ে নদীর ওপারের অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলাম, একখানা বেশ বড় নৌকো ভাটিতে যাচ্ছে। বললাম"—ভূষণ, ঐটি হয়ত জলের নৌকো। একবার এগিয়ে দেখ না।"

—"জলের নৌকো আসবে কাল। ওরা ইট আনতে যাচ্ছে।"

হতাশ হয়ে পড়লাম। সেখানে রাত কাটানো অসম্ভব; অথচ কোথায় যে যাব, তাও বুঝতে পারলাম না। একবার ভাবলাম, ষ্টেশনে চ'লে যাই। কিন্তু তা হ'লে পাকা আড়াই ক্রোশ পথ ভাঙতে হবে। পথে কাদা, রাত অন্ধকার; দুটো বাঁশের সাঁকো আছে। সেখান থেকে প'ড়ে যাওয়ার বা পথ ভুল হবার সম্ভাবনাও খুব। এখন এই বিপদে একমাত্র সহায় ঐ ভূষণ। কিন্তু ওর ব্যবহারে মনুষ্যত্বের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

ভূষণ উঠে দাঁড়িয়েছিল; আমিও মাচা থেকে নেমে তার পাশে দাঁড়ালাম। সে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেল; আমিও তার পিছন পিছন গেলাম। পশ্চিম আকাশ জুড়ে মেঘ করেছিল। অকালসন্ধ্যার ছায়ায় সব আবছা হয়ে এসেছে। দূর থেকে একটা হাঁক ভেসে এল। লক্ষ্য করলাম, ভূষণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

কিন্তু আমার মনে হ'ল, ও হয়ত মট্‌রা আমাদের হদিস নিচ্ছে; বললাম—"ভূষণ, ঐ মট্‌রা ..."

সে হেসে বললে—"সেই আশায় থাক, বাবু। আমি চললাম।"

সে বারান্দা থেকে পৈঠায় পা দিল।

আর আমার আশা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার প্রাণ

বাঁচাবার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার পরিষ্কার মনে হ'ল, ভূষণ ও মটরা ডাকাতের দোসর। দূর থেকে ওকে কে যেন ইসারা করলে। আমার সঙ্গে মূল্যবান কিছুই নেই;— আছে কেবল প্রাণটা, অবশ্য তারই মূল্য আমার কাছে এত যে, বাঁচতে গিয়ে মরতেও পিছ-পা নই। দু' আনা পয়সা আর একখানা পুরানো কাপড়ের জন্যেও আমাদের দেশের ডাকাতেরা মানুষ খুন করে!

আমিও ভূষণের পিছন পিছন নেমে গিয়ে বললাম—"ভূষণ, তুমি যখন থাকবেই না, তখন তোমার বাঁশের লাঠিখানা আজকের মত আমায় ধার দাও।"

-"বেড়ে কথা বলেছ!"

—"তবুও একটু সাহস হবে।"

—"তুমি লাঠি চালাতে জান?"

—"পারি কিনা দেখি—" ব'লেই আমি একটানে তার হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নিলাম। বেশ ভারী লাঠি।

ভূষণের চোখ দুটো ফস্‌ফরাসের মত জ্বলে' উঠল; সে হাত বাড়িয়ে বললে—"দে লাঠি।"

বললাম—"চুপ্‌। একটি কথা বলেছ কি এই লাঠি দিয়ে তোমার মাথাটা মাটির হাঁড়ির মত গুঁড়িয়ে ফেলব। দেখছ, আমার হাতের কব্জি দুটো?"

ভূষণের দৃষ্টি ও মুখের চেহারা হয়ে উঠল অসহায়, ক্রুদ্ধ বাঘের মত। দাঁতগুলো এক-একবার কড্‌কড্‌ করতে লাগল।



বললাম—"ওঠ্‌ ঐ বারান্দায়।"

সে তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

—"এক—দুই—তি—"

সে বারান্দায় উঠল।

—"ঘরের ভিতর চল্‌।"

সে ঘরে ঢুকল।

—"ঐ বিছানা আর বাক্সটা মাথায় তোল্‌।"

সে একবার আমার দিকে প্রখরচোখে তাকিয়ে সে-ছুটো মাথায় তুলে নিল।

—"চল্ আমার আগে আগে। কোন শব্দ করলে বা ছুটলে তোকে মেরে ফেলে, নদীতে ভাসিয়ে দেব।"

নদীর ধারে ধারে পথ। সে আমার আগে আগে চল্‌ল, আমি চল্‌লাম ঠিক তার পিছন পিছন। সিকি মাইল যেতে না যেতেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল; বাতাস উঠল, মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে লাগল। নদীপারে শিয়াল ডেকে উঠল। আমি টর্চ জ্বাললাম। টর্চের আলোটা রইল ভূষণের পিঠের উপর।

সে চলে আর মাঝে মাঝে জোরে নিশ্বাস ফেলে। তখন মনে হয়, একটা বুনো মহিষ রাগে ফোঁস-ফোঁস করছে; কিন্তু সে বন্দী।

এবার ডাকলাম—"ভূষণ।"

সে সাড়া দিল না।

ভাবলাম, যে শাস্তি দিয়েছি এর উপর আর তাকে অপমান করতে চাই না।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় ক্রোশ পথ পার হয়ে প্রথম সাঁকোটার এপারে এসে পৌঁছলাম। ভূষণ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"বাবু, আর যেতে পারব না।"

—"তোকে যেতেই হবে।"

—"না, হুজুর। শুধু শুধু আমাকে জেলে দেবেন ?"

—"কি রকম ?"

—"পুলিশ থেকে আমার সাঁকো পার হওয়া বারণ।"

—"মিছে কথা।"

—"ঐ থানা—আলো জ্বলছে। আমি যাব না।"

—"তুই আমাকে আজ তা হ'লে মেরে ফেলতিস্ ?

—"বেটক্করে লাগলে হয়ত মরতেন। খুব বেঁচে গেলেন।"

—"ওটা যে থানা তোর কথায় বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?"

—"হয় না হয়, হাঁক দিন।"

হাঁক দিতে হ'ল না ; ওপার থেকেই মোটাগলায় হাঁক শোনা গেল—"কৌন বা।"

ভূষণ তৎক্ষণাৎ সেখানে ব'সে তার মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে একলাফে অন্ধকারে ডুবে গেল।

আমিও সভয়ে বিছানা ও বাক্সটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে সাঁকো পার হয়েই দেখি সম্মুখে দুই লাল পাগ্‌ড়ি। তাদের হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি, গায়ে উর্দ্দি।

আমার বুকের ভার নেমে গেল। তাদের একজন অত্যন্ত স্থূলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"তোম কৌন্ হায় ?"

নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনার পর ষ্টেশনের রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে—"সিধা। বহুৎ বাঁচ গিয়া। শালা—লোক—" তার পরের বিশেষণগুলো আর বুঝতে পারলাম না। যতদূর পারলাম তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলাম।

যখন ষ্টেশনে পৌঁছলাম, রাত তখন ন'টা। আধঘণ্টা পরেই গাড়ী। পকেটে আগাম মাহিনার কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। তাই দিয়ে টিকিট কেটে কর্ম্মস্থল থেকে সুদীর্ঘ পনেরো ঘণ্টা পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। সেদিন অন্ন লাগল মিষ্ট; অন্নদাতার ভাষাগুলোও লাগল বড় মোলায়েম।

তারপর ত অনেক দিন কেটে গেল। ইটের পাঁজার মালিকের দেওয়া সেই আগাম আড়াই টাকা থেকে মাসিক আঠারো টাকা হিসেবে—একত্রিশ দিনে মাস হ'লে একদিনের মাহিনা কেটে নিয়ে—বাকি টাকাটা আর ফেরৎ দেওয়া হয় নি। তা খরচ হয়ে গেছে। সেই ইটের পাঁজাগুলো কার কপালে সোনার পাহাড় হয়ে ঠেকেছে, তাও জানি না; কিন্তু ভূষণের সেই পাকা বাঁশের লাঠিখানা আজও আমি যত্ন ক'রে রেখেছি।



দত্তমশায়—সাতকড়ি মুখুয্যের মুহুরি বিপ্রদাস দত্ত—কাজে এসেছেন সেই বেলা এগারোটায়। এখন বাজল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

তাঁর সামনে কাঠের হাত-বাক্স, তার উপর খেরো-বাঁধানো মোটা খাতাখানা খোলা; ডান পাশে সীসের দোয়াত, হাতে হাঁসের পালকের কলম। হারিকেনটা ছিল সামনে খানচারেক পুরানো পাঁজির উপরে একখানা পুরু পিচবোর্ডে বসানো।

তেলটা খারাপ, পল্‌তেটাও সম্ভবতঃ কয়দিন কাটা হয় নি। তাই আলোর চেয়ে ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য বেশি। চিম্‌নিটা ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে।

দত্তমশায় পল্‌তেটা একবার কমিয়ে আবার তখনই খানিকটা উস্কে দিলেন। ফলে প্রচুর ধোঁয়া বা'র হয়ে চিম্‌নিটার ভিতর ঘুরপাক দিয়ে শিখাটাকে আরও ঢেকে ফেলল। দত্তমশায় তাড়াতাড়ি পল্‌তেটা কমিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, চাকরটাকে ডাকবেন কিনা।

কিন্তু আর কতটুকু সময়ই বা কাজ করবেন? রাত হয়ে এল। তার উপর ঝুপ্‌ঝুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। বেশি দেরী করলে আবার সঙ্গী পাবেন না। সেখান থেকে তাঁকে বাড়ী যেতে পথ ভাঙতে হবে পাকা এক ক্রোশ।

দত্তমশায়ের হাতে তখন ভুলি দাসীর আড়াই বছরের হিসেব। কর্ত্তার ভাগ্নে মহিম এসে বললে—"বিপ্রদাসবাবু, এই অঙ্কটা কষে দিন্‌ না, কিছুতেই মিলছে না।"

—"যা—যা এখন।"

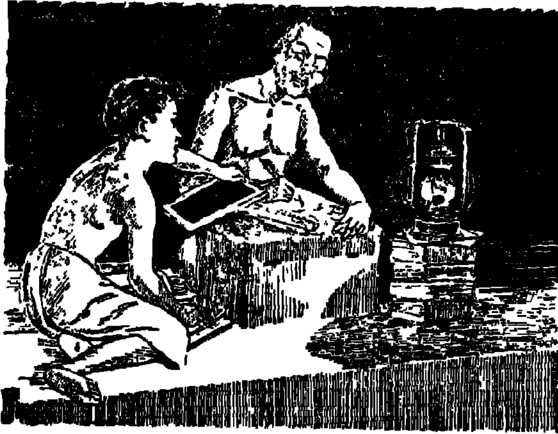
—"আপনার ছুটি পায়ে পড়ি। না হ'লে কাল মার খাব।"

—"কাল কষে দেব—"

—"না, বিপ্রদাসবাবু, আপনার—"

—"রোজ কাজের সময় এসে গোলমাল!"

মহিম ফরাসে উঠে' শ্লেটখানা দত্তমশায়ের বাক্সের উপর রেখে অনুনয়ের সুরে বললে—"দিন্—দিন্।"



—"কি অঙ্ক? পাটীগণিত কই? কি বলছে দেখি—'এক মহাজন একটা চাষীকে বাৎসরিক সাত টাকা হার সুদে সাতাশী টাকা ধার দিল। চাষী তাহাকে তিন বৎসর পরে বাকি সুদে ও আসলে দিল একশত টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। তাহা হইলে মহাজনটি চাষীর নিকট হইতে ইতিমধ্যে কতটাকা সুদ পাইয়াছিল?"

এ ত খুব সোজা অঙ্ক রে! প্রথমে বা'র করতে হবে—"

বাইরে খড়মের আওয়াজ হ'তে লাগল—খট্-খট্। মহিম চট্ ক'রে শ্লেট ও পাটীগণিত তুলে নিয়ে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল। দত্তমশায়ও কর গুণতে লাগলেন।

কর্ত্তা ঘরে ঢুকেই হাঁকলেন—"কেদার—কেদারে—"

কেদার সাড়া দিয়ে একটু পরেই ঘরে ঢুকল। তার বাঁ হাতে হুঁকো, ডান হাতে কল্‌কে। কল্‌কেটায় সে ফুঁ দিতে দিতে আসছিল। কল্‌কের তলা দিয়ে তূলোর পাঁজের মত ধোঁয়া বা'র হচ্ছে। তার একটু উড়ে গিয়ে কর্ম্মক্লান্ত দত্তমশায়ের নাকে ঢুকল। তিনি আরাম বোধ করলেন।

মুখুয্যেমশায় বললেন—"এখানে মহিম এসেছিল না?"

—"মহিম?—আজ্ঞে—চ'লে গেছে।"

—"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। আজ ক'জনের হিসেব করলে?"

—"হিসেব? ভোলা বিশ্বাস, নরেন হাজরা, সতীশ গুঁই, আর লক্ষ্মীমণির।"

—"মোটে এই ক'জন! ভুলির কি হ'ল?" ব'লে মুখুয্যেমশায় হুঁকোটা কেদারের হাত থেকে নিয়ে টানতে লাগলেন।

—"আরম্ভ করেছি। কিন্তু এদিকে রাত—"

—"রাত আর কতটুকু? তুমি ওদিকে আসবে বেলা তুপুরে, যাবে সন্ধ্যের বাতি জ্বলতে না জ্বলতে। তোমাকে ত এর আগে অনেক দিন বলেছি—না পার, ছেড়ে দাও।"

—"আজ্ঞে খেয়া-পারের পথ। রাত হয়ে গেলে সঙ্গী—"

—"বেশ ছেড়ে দাও। কাজের মধ্যে ত দেখি, মহিমের সঙ্গে গল্প—"

কথাগুলো দত্তমশায়ের বুকে গিয়ে বিঁধল। গল্প তিনি করেন, সত্যই, কিন্তু দিনের মধ্যে সে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি হবে না। তিনি এক সময়ে আসামের চা-বাগানে চাকরি করতেন। ছেলের মন! সেই জঙ্গলের গল্পই শুনতে ভালবাসে। তবে কখন কখন সে অঙ্কটা করিয়ে নিয়ে যায়, দু'চারটে ইংরেজী কথারও মানে জিজ্ঞাসা করে। তিনি শুভঙ্করীর অঙ্ক ভালই জানেন, ইংরেজী কথাও দুটো চারটে যে না জানেন এমন নয়। তবে বড় বড় কথা—! ছেলেটাকে তাঁর লাগে ভাল। সারাদিনই ত খাতার উপর ঘাড় গুঁজে থাকেন। কেদারের দয়া হ'লে, দু'একবার তামাক খাইয়ে যায়। দিনের মধ্যে দু'চারজন খাতক আসে। তখনই যা দুটো চারটে কথা বলেন, কিন্তু তাও দুঃখের, সকলেই বলে—'কষ্টে আছি।'

দেড বছর আগে তিনি চা-বাগান থেকে এসেছেন। ছেলে-মেয়েটাকে খেয়েছে কালাজ্বরে; দেশের জায়গা-জমি গিলেছে পাঁচভূতে। দুইয়ের কোনটাই আর ফিরে আসবে না। এখন সম্বল ভিটেটুকু। সংসারে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। মন ভেঙ্গে গেছে, শরীরও অপটু হয়ে পড়েছে। নূতন আর কিছু করবার উপায়ও

নেই। তাই এই মাসিক বারো টাকা মাইনের মুহুরিগিরি। কিন্তু এও দিনের মধ্যে তিন-চারবার টলমল করে। দত্তমশায়ের চোখ দুটো কেমন ক'রে উঠল।

কর্ত্তা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"ওটা আজ শেষ ক'রে যেতে হবে।"

ঘরের পিছনেই বড রাস্তা। জানালা খোলা ছিল। ঐ দূরে অন্ধকারে একটা আলো জ্বলছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দত্তমশায়ের গাঁয়ের যদু ঘোষ ডাকলে—"ওগো দত্তমশায়! যাবে নাকি? দেয়া চেপে আসছে।"

দত্তমশায় চকিতে একবার কর্ত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—"দেরী আছে।"

যদু কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল না; বললে—"তবে এস। আমরা ঐ যোগেন ঠাকুরের দোকানে 'প্রেতীক্ষে' করছি। বলাইও যাবে; পিছে আসছে।"

দত্তমশায় আর জবাব না দিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে ভুলি দাসীব হিসেব কষতে লাগলেন।

কর্ত্তা বললেন—"আমি যে দ্বিজপদর বাগানখানা কিনব একথাটা ষষ্ঠি জানল কি ক'রে?"

ষষ্ঠি কর্ত্তার এক শরিক; উপস্থিত দত্তমশায়দের গ্রামে বাস করেন।

দত্তমশায় বললেন—"আজ্ঞে, আমি তা জানি নে।"

—"তুমি জান না? আমি যে কিনব একথা এক তুমি ছাড়া আর কারও জানবার নয়।"

দত্তমশায় নীরব। কর্ত্তার সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠল; বললেন—"তুমি তলে তলে ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করবার মতলব করেছ?"

দত্তমশায় বললেন—"দেখুন, আপনি অযথা আমার উপর সন্দেহ করছেন। যাই হোক, আপনার যখন ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার এখানে আর কাজ করি, তখন আমাকে জবাব দিন্।"

মুখুয্যেমশায় চিরকাল লোকের কাতর প্রার্থনা শুনে এসেছেন; এমন স্পষ্ট জবাব কখনও শোনেন নি। কাজেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; বললেন—"বটে···বেশ, যেতে পার।"

দত্তমশায় খাতার উপর কলমটা রেখে বললেন—"আজ চৌদ্দই আশ্বিন। গত মাসের মাইনে এখনও পাই নি।"

মুখুয্যেমশায় শান্তকণ্ঠে বললেন—"কাল এসে নিয়ে যেয়ো।"

—"দেখুন, আমি আর এখানে আসতে চাই না। আমার হাতেও কিছু নেই।"—দত্তমশায় জবাব দিলেন।

মুখুয্যেমশায় কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—"তুমি কি নিয়েছ না-নিয়েছ, আগে দেখি; তারপর ত হিসাব ক'রে দেব।"

—"এই ত খাতা রয়েছে। আমি একটি পয়সাও নিই নি।"

—"আজ আমার সময় নেই। কেদার···কেদারে—"

কেদার বারান্দায় বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা শুনছিল। সকল কথা লুকিয়ে শোনাই তার স্বভাব। সে ঘরে ঢুকতেই মুখুয্যেমশায় বললেন—"নরহরিকে চট্ ক'রে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

কেদার ছুটল। বৃষ্টি তখন আর একটু জোর হয়ে এসেছে। নরহরির বাড়ী সেখান থেকে খান দুই বাড়ী পরে। সে বাড়ীতেই ছিল এবং অবিলম্বে এসে উপস্থিত হ'ল—যেন এইটুকুরই সে অপেক্ষা করছিল।

কর্ত্তা বললেন—"ওকে খাতাপত্র বুঝিয়ে দাও।···নরহরি, সব বুঝে নে।"

বুঝাবার বিশেষ কিছু ছিল না; দত্তমশায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই নরহরিকে খাতাপত্র বুঝিয়ে বেড়ার গা থেকে উঁচু কলার ও চওড়া-কফ-ওয়ালা আধময়লা শার্টটা খুলে নিয়ে, ফরাস থেকে নামলেন। তারপর কাদামাখা ক্যাম্‌বিশের জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে তালি-দেওয়া ও বাঁটভাঙ্গা ছাতাটা হাতে ক'রে বললেন—"আমি যাচ্ছি বাবু।"

কর্ত্তা কোন উত্তর দিলেন না।

দত্তমশায় নমস্কার ক'রে অন্ধকারে বা'র হয়ে গেলেন। সৌভাগ্যবশতঃ যোগেন ঠাকুরের খাবারের দোকানে তখনও যদু ঘোষেরা তাঁর জন্যে 'প্রেতীক্ষে' করছিল। তাঁকে আর একা বাড়ী যেতে হ'ল না।···

পরদিন ঘুম ভাঙ্গতেই দেখেন, ষষ্ঠি মুখুয্যের লোক এসে তাঁকে ডাকছে। লোকটি বললে—"কর্ত্তা একবার ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি চলুন।"

দত্তমশায় আন্দাজে বুঝে নিলেন ব্যাপার কি।

সংবাদ সুখের হ'লেও তাঁর মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি দুঃস্থ ব'লে ষষ্টিবাবু ডাকেন নি, ডেকেছেন তাঁর শরিকের সর্ব্বনাশ করবার উপায়রূপে তাঁকে ব্যবহার করবেন ব'লে। ইচ্ছা না থাকলেও দত্তমশায় তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন; কাজেও বহাল হ'লেন। কিন্তু সেদিন আর কাজে গেলেন না।

সারাদিন ব'সে ব'সে তিনি নিজ জীবনের পুরানো কথাগুলো ভাবতে লাগলেন···আসামের চা-বাগানে থাকলেই বা ক্ষতি ছিল কি? সেখানে ত—।

সহসা মনে পড়ল, সে-দিন মাইনে পাবার কথা। তখনও বেলা অনেক আছে। তিনি জামাটা গায়ে দিয়ে জুতো জোড়া প'রে ছাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর যখন

সাতকড়ি মুখুয্যের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা চারটে বাজে। সূর্য্য বাঁশবনের মাথায় ঢ'লে পড়েছে।

মুখুয্যেমশায় কাছারিঘরেই ছিলেন; তাঁকে দেখেই বললেন —"কি খবর হে?"

—"মাইনের টাকা ক'টা—"

—"মাইনে? কিসের মাইনে? তুমি কি আজকাল নেশা-টেশা করছ? না ষষ্টির সেরেস্তায় কাজে বহাল হয়েই জোচ্চুরি—"

দত্তমশায় অবাক্, বললেন—"আজ্ঞে, একি কথা বলছেন?"

—"মাইনে নিয়েও যখন তুমি—"

"মাইনে ত আমি নিই নি।"

—"নাও নি? জোচ্চুরি? ঐ খাতায় সই রয়েছে কার?" ব'লে মুখুয্যেমশায় মাইনের খাতাখানা তাঁর ভূতপূর্ব্ব মুহুরির সামনে মেলে ধরলেন।

দত্তমশায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন, খাতায় এক মাস চৌদ্দ দিনের মাইনে নিয়ে তিনি সই ক'রে দিয়েছেন— শ্রীবিপ্রদাস দত্ত। সবই ঠিক—মায় আঁকড়ি ও টানটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই হেলে আছে।

কাছারিঘরের পাশেই একখানা কাঠ-কুটো রাখবার চালা। তারপর অন্দরের উঠোন। কাঠ-কুটোর ঘরে দাঁড়িয়ে কাছারিঘরের সব কথা শোনা যায়।

দত্তমশায় একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন; কর্ত্তাকে নমস্কার করতেও তাঁর মনে পড়ল না।

পথ দিয়ে চলেছেন। বেলা প'ড়ে আসছে। ছায়া কোথাও হচ্ছে দীর্ঘতর, কোথাও হচ্ছে আরও ব্যাপক, কোথাও গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে এবং যেখানে ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সেখানে আর ভেদ নেই—সব মিশে গেছে।

দত্তমশায় মাঠে এসে পড়লেন। দূরে দেখা যায় খেয়া-ঘাট। খেয়াখানা যাত্রী নিয়ে ধীরে এপারে আসছিল। তাঁর পাশ দিয়ে পরিচিত দুই-একজন চ'লে গেল। তিনি তাদের চিনেও চিনতে পারলেন না।

সূর্য্য একেবারে ডুবে গেছে; সব অস্পষ্ট হয়ে এল। ঘাটও একেবারে সামনে।

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাকলে—"দত্তমশায়—দত্তমশায়—"

স্বরটা পরিচিত ও মিষ্ট; ফিরে দেখেন, মহিম।

তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন, কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন—"কি মহিম!"

—"একটু দাঁড়ান।"

মহিমের বয়স দশ-এগারো বছর হবে; কিন্তু ভারী সাহসী ছেলে। পাড়াগাঁয়ে তার বাস—না হবেই বা কেন?

সে কাছে এসে কোমর থেকে কতকগুলো টাকা ও নোট বা'র ক'রে বললে—"নিন্—মামীমা পাঠিয়েছেন।"

দত্তমশায় প্রথমটা বুঝতে পারলেন না; বললেন—"কেন? কা'কে?"

—"আপনাকে। আপনাকে ওরা টাকা দিলে না। তাই মামীমা বললেন, গরীবের পাওনা টাকা না দিলে অমঙ্গল হবে। নিন্—" ব'লে সে দত্তমশায়ের হাতখানা টেনে ধরলে।



দত্তমশায়ের চোখ দুটি জলে ভ'রে গেল। তিনি প্রথমটা কথা বলতে পারলেন না। ক্ষণপরেই নিজেকে সংযত ক'রে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন—"না বাবা! এ

টাকা আমি নিতে পারি না। তোমার মামীমা মা লক্ষ্মী। তাঁকে আমার প্রণাম দিও।"

মহিম বললে—"না, সে হবে না। আপনাকে নিতেই হবে।" ব'লে সে আবার হাত চেপে ধরলে।

দত্তমশায় চোখ দুটো মুছে বললেন—"যাঁর টাকা তাঁকেই ফিরিয়ে দিও ; আর ব'লো—দত্তমশায় প্রণামী দিয়েছেন।"

—"না নিলে আপনার বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসব।"

—"না। রাত হয়ে আসছে। চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।"

—"আমায় এগিয়ে দিতে হবে না। এপথে কতদিন সন্ধ্যের পর আমি একা এসেছি। নিন্—"

দত্তমশায় মহিমের হাত চেপে ধ'রে খেয়া-ঘাটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন—"এ টাকা নেওয়া বড অপরাধের। এ ত আমার প্রাপ্য নয়।"

তাঁর কথাগুলো শেষ হ'তে না হ'তে কারা যেন পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর ও মহিমের হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠল —"পেয়েছি! শালা পালাচ্ছে—ছেলেটাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—এই যে টাকাও আছে—"

দত্তমশায় চম্‌কে দেখেন, নরহরি ও তিনজন পেয়াদা। অতঃপর তাঁর ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা সুরু হ'ল, তা না বলাই ভাল।

নরহরিরা এসেছিল কর্ত্তার আদেশে। কেদারের স্বভাবসুলভ

চাপল্যবশে আড়ালে দাঁড়িয়ে সে গিন্নীঠাকরুণকে মহিমের হাতে টাকা দিতে দেখে এবং তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়, তাও শোনে। মহিম টাকাগুলো পেটকাপড়ে গুঁজে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পুকুরের ধার ধরতেই সে এসে কর্ত্তার কাছে নালিশ করে। কর্ত্তা দেখলেন, দত্তমশায়কে আরও খানিকটা শাস্তি দেবার চমৎকার সুযোগ। তবে এবারকার শাস্তিটা হবে কঠোর। বেটা ষষ্টির দোসর! ...

দত্তমশায়কে পুলিশে দেওয়া হ'ল; পুলিশও যথারীতি তাঁকে মহকুমায় চালান দিলে। তাঁর নামে অভিযোগ—শিশু মহিম ও একশ' টাকা চুরি। যদিও পাওয়া গেল মাত্র পঁচিশ টাকা; তাও আবার ছিল মহিমের কাছে!

অপহৃত বস্তুগুলোর একটি ত কথা বলতে পারে।

সাতকড়ি মুখুয্যে মহিমকে বললেন—"খবরদার! কথাগুলো যেন মনে থাকে। উকিল জিজ্ঞাসা করলেই বলবি—বিপ্রদাস আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর হাকিমকে বলবি 'হুজুর'।"

মহিম বললে—"হাঁ।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলা উঠল। মজার মামলা; সেইজন্যে তা দেখবার জন্য আদালতে লোক ভেঙ্গে পড়ল।

সাতকড়ি মুখুয্যে মহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মনে আছে?"

—"হাঁ।"

—"কি বলবি ?"

মহিম পাখীর মত শিখানো বুলিগুলো ব'লে গেল।



বেচারা দত্তমহাশয়ের পক্ষে দাঁড়ালেন এক ছোকরা উকিল। যদি লোকটাকে খালাস করা যায়, নাম হবে। নাম হ'লেই পসার। উকিলটি ছোকরা হ'লেও চালাক। তিনি এতক্ষণ কাছারির বাইরে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করছিলেন। লোকটি একখানা বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে কি যেন বলছিল।

সাতকড়ি মুখুয্যের সাক্ষীর অভাব ছিল না। তাদের মধ্যে

মহিমও একজন। দত্তমশায়ের উকিল অন্যান্য সাক্ষীকে জেরা করবার আগে মহিমকে জেরা করতে উঠলেন; কিন্তু মহিমের মাথা কাঠগড়া ছাড়িয়ে উঠল না। আদালত-সুদ্ধ লোক তাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়াল।

হাকিম পেয়াদাকে বললেন—"ওকে কোলে নিয়ে দাঁড়াও।"

পেয়াদা মহিমকে কোলে নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই সে ভয়ে বিস্ময়ে আদালত ঘরের চারধারে একবার তাকিয়ে হাকিমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

দত্তমশায়ের উকিল তাকে জেরা করবার উদ্যোগ করতেই হাকিম নিজেই মহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম কি?"

—"শ্রীমহিমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বিপ্রদাস দত্তকে দেখিয়ে বললেন—"ঐ লোকটাকে চেন?"

মহিম দত্তমশায়ের ম্লান শুষ্ক মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বললে—"হাঁ···স্যার···হুজুর!"

—"ও তোমাকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল?"

—"দত্তমশাই?···উনি ত আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যান নি। মামীমা আমাকে ওঁর হাতে দেবার জন্যে পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। আমি তাই দিতে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম।··· মামা ওঁকে মাইনে দেন নি কি না।"

আদালত-কক্ষে সহসা কৌতুক ও বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন—"সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলে কেন ?"

—"টাকাগুলো উনি কিছুতেই নিতে চাইছিলেন না যে···উনি তখন কাঁদছিলেন; বলছিলেন—এ টাকা আমি নিতে পারি না।"

হাকিম আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না; বললেন—"যাও।"

মুখুয্যেমশায়ের উকিল বললেন—"হুজুর, ও ছেলেমানুষ !"

দত্তমশায়ের উকিল বললেন—"হুজুর, হুকুম দিলে মহিমের মামীমাকেও আদালতে উপস্থিত করতে পারি···"

মুখুয্যেমশায়ের উকিল ব'লে উঠলেন—"সে কি ক'রে হয় ? তিনি পর্দ্দানশীন মহিলা।"

সাতকড়ি মুখুয্যে তখন আদালত-কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন। দত্তমশায়ের চোখ ছুটি জলে ভ'রে উঠেছে। কাগজের উপর হাকিমের কলম চলছে, লোকে কানা-ঘুষা করছে, মুখুয্যেমশায়ের উকিল মাথা চুলকোচ্ছেন।

মামলার পরিসমাপ্তি ঘটল। দত্তমশায় খালাস পেলেন। মহিমও মাতুলগৃহে ফিরে গেল। কিন্তু তার সেখানে একটু ঠাঁই হলেও মাতুলের স্নেহ থেকে সে হ'ল বঞ্চিত। বঞ্চিত হ'লেও মামীর কাছে তার আদর আরও বাড়ল।



এক টাকা সাড়ে তিন আনার গোলমাল !

আপ ও ডাউন ট্রেনের টিকিট বিক্রয় পাওয়া যাচ্ছে ছাপ্পান্ন খানা, কিন্তু মাশুল বাবদ রয়েছে মোট একষট্টি টাকা দশ আনা। নূতন বদলি হয়ে এসেই গুনোগার ! ষ্টেশনটি আবার এমন যে উশুল করবার যো নেই। পান আর মাছে কি হবে ? তা ছাড়া এখন খাবার লোকও ত—

খাতা থেকে মুখ না তুলেই 'ছোটবাবু' শ্রীরঞ্জন চৌধুরী হাঁকলেন—"এই ফত্রিঙ্গ—ফত্রি—উঃ। যেমন মশার ডাক, তেমনিই ডাকছে বেটার নাক।"

ছোটবাবুর তামাকের অভ্যাস আছে।

পিছনে তার-ঘরের দরজায় ফত্রিঙ্গা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একে শীতকাল, তার উপর রাত তখন দুটো। কিছুক্ষণ আগে ডাকগাড়ী 'পাস' হয়েছে ; মালগাড়ী-খানাও এক্ষণে বিঘাটি ষ্টেশন ধরে-ধরে। কাজেই ফত্রিঙ্গা নিশ্চিন্ত। ছোটবাবু একবার ভাবলেন, নিজেই তামাকটুকু সেজে নেন। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রবল হ'ল না। আবার খাতায় ঠিক দিতে আরম্ভ করলেন।

"এই ত টিকিটের হিসাব দিব্যি মিলে যাচ্ছে।" সহসা ছোটবাবুর শুষ্ক শীর্ণ মুখের উপর দিয়ে একটু বিষাদের হাসি খেলে গেল। মনে মনে বললেন—"তখন কি জানতাম, একদিন অ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন-মাষ্টার হয়ে চন্দনপুর ষ্টেশনেই বদলি হয়ে আসব। ওঃ! সে কত বছর আগেকার কথা। তখন এখানে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফরম্, পাকা ষ্টেশন-ঘর, ওয়েটিং রুম—কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝখানে ছিল একখানা ছোট খড়ের ঘর, তার চাটাইয়ের নীচে আলকাতরা-মাখানো বেড়া। পিছন দিকে পাশাপাশি দুটো খাদ জলে ভরা। সেগুলোতে

কলমি আর হেলঞ্চাবন। পাড়ের উপর কাশের ঝাড়। খাদের ওপারে কোয়াটারস্;—ছুটো খাদের মাঝ দিয়ে সেদিকে যাতায়াতের উঁচু পথ। তার শেষে একটা বাঁকা নিমগাছ। প্ল্যাটফরমটা ছিল এত নীচু—ট্রেন থেকে নামবার সময় কয়েক বার ত পডতে পড়তে রয়ে গেছি। সে সব দিন আর নেই। হাঃ—হাঃ—অক্ষয় আর আমি—”

ফত্রিঙ্গা কম্বলটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে বললে—“কি বলছেন? ‘ইস্‌পিশ্যাল’ আছে?”

শ্রীরঞ্জনবাবুর চমক ভাঙ্গল; বললেন—“না, একটু তামাক দিবি বাপ্?”

ষ্টেশন থেকে কাঁচা-পাকা সডক চ’লে গেছে সোজা উত্তরে। সড়কটার ছ’পাশে ঝোপঝাড় জঙ্গল। তার মাঝে মাঝে চারা খেজুর, শিমুল, আম ও বাবলা গাছ নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সডকের মাঝে ছুটি খাল, গরুর গাড়ীর চাকায় তৈরী হয়েছে। ছ’পাশে মাঠ, মাঠের শেষে গ্রাম। সড়ক ধ’রে ক্রোশ দেড়েক ভাঙ্গলেই চন্দনপুরের বিল। বিলটা শেষ হয়েছে একেবারে অক্ষয়দের গ্রাম মালাড়ার পুবে। ঐ মালাড়াতেই ছিল শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ী।

ফত্রিঙ্গা তামাক এনে বললে—“নিন্ বাবু।”

শ্রীরঞ্জনবাবু হুঁকোটা নিয়ে নলচে ধ’রে একমনে টানতে

লাগলেন ; তাঁর বাঁ হাতখানা রইল খাতার উপর। ক্রমে ধোঁয়ায় তাঁর মুখের চারধার ঢেকে গেল।

"অক্ষয়টা—হাঃ—হাঃ—একবার আখক্ষেতে আখ ভাঙ্গতে গিয়ে···কি রে অক্ষয় ?—তুই ? এই রাতে—? বস্—বস্। সে কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বি ?" শ্রীরঞ্জনবাবু আত্মহারা হয়ে পড়লেন।



অক্ষয় জিজ্ঞাসা করলে—"কবে এসেছিস্ ?"

—"দুটো রাতও কাটে নি। তোর চিঠি পেয়েছিলাম। যা গোলমাল গেল ক'দিন ! উত্তর দেওয়া হয় নি। দেখ দেখি ভাই কি গ্রহের ফের। সেই চন্দনপুর ষ্টেশনেই এলাম ছোটবাবু হয়ে। তারপর কি খবর ? কিন্তু এই রাত্রে তুই—?"

অক্ষয়ের আপাদ-মস্তক ঢাকা, কেবল মুখখানি খোলা। তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটিকে আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে; বললেন—"রঞ্জন, তোর চুল সবই পেকে গেছে—"

—"পাকবে না? কত বয়স হ'ল বল দেখি? তা ছাড়া— কিন্তু তোর চেহারা বেশ আছে। বসছিস্ না কেন?"

অক্ষয় টেবিলের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে স'রে গিয়ে টিকিট-বক্‌সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরঞ্জনবাবুর মনে হ'ল, অক্ষয়ের ব্যবহারে আন্তরিকতা নেই, সে যেন একটু দূরে স'রে গেছে; বললেন—"তামাক খা। ওহো! আমি ভুলেই গেছি এই বদ্ অভ্যাসটা তুই করিস নি। হ্যাঁরে অক্ষয়! বিলের ধারে বটতলায় সেই পোড়ো মন্দিরটা এখনও আছে? মাঠের ধারের সেই আমগাছ ক'টা? আমাদের মামার ভিটে?"

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে জানালেন—হাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই সপরিবারে এসেছিস্?"

—"নাঃ। নূতন জায়গা···সব দেশে। আমাদের দেশের কথা তোর মনে পড়ে?"

—"হাঁ। সেই চিড়ে, গুড়, নারকোল, আর সকলের উপর কাকিমার যত্ন এখনও ভুলতে পারি নি।"

মায়ের কথা মনে প'ড়ে গেল। শ্রীরঞ্জনবাবু একটা নিশ্বাস ফেললেন; তারপর বললেন—"যখন দেশে যাব ওদের আনতে,

আসবার সময় তোর জন্য চিড়ে, গুড়, নারকোল এনে মালাডায় গিয়ে দিয়ে আসব—"

—"কিন্তু আমি ত ওখানে নেই।"

—"সে কি ? কোথায় আছিস্ ? তোর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ?"

—"তা'রা সকলেই আছে। কেবল আমিই চ'লে এসেছি।"

—"এই বয়সে রাগ ক'রে বিরাগী হয়েছিস্ ? কার উপর রাগ—স্ত্রীর না ছেলের ?"

—"কারো উপরই আমার রাগ নেই। আর থাকতে পারলাম না !"

—"কোথায় যাচ্ছিস্ ? একি ছেলেমানুষী ? সে হবে না—টিকিট ত আমার হাতে। ছাড়ছি না। বাড়ী না যাও এখানে থাক। হতভাগারা এল ব'লে তোর খোঁজে। আমি নিজে যাব তোর সঙ্গে—"

অক্ষয় একটু হাসলেন ; তাঁর মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

শ্রীরঞ্জনবাবু বললেন—"কোন গুরু পাকড়েছ বুঝি ? তিনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন—কা তব কান্তা·· ?"

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং। বাইরে কোথায় কাক ডাকছে। দূরে রেল লাইনের ধার থেকে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল—রাত শেষ হয়ে এল।

"দাঁড়া ভাই, কাজটা সারি—ভোরের গাড়ীর সময় হ'ল।" ব'লে ছোটবাবু তাড়াতাড়ি উঠে হাত থেকে হুঁকোটা টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে রেখে টেলিফোনের কাছে গেলেন। তারপর ফোন ধ'রে হাঁকলেন—"হ্যাঁ—কি? লেট হয় নি? আসছে? ওরে ফত্রিঙ্গা—এই ফত্তে। গাড়ীর ঘণ্টা দে।" সেখানকার কাজ সেরে টিকিট-বাক্সের দিকে যেতে যেতে বললেন —"তারপর···ব্যাপারটা কি খুলে বলত।" ব'লে অক্ষয়ের দিকে চোখ তুলে দেখেন, সেখানে অক্ষয় নেই। এদিক-ওদিক তাকালেন, কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন বাইরে যাবার দরজার কাছে ব'সে ফত্রিঙ্গা তার বিছানাটি গুটিয়ে নিচ্ছে। শ্রীরঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাকল না। ঘরের দুটি দরজা, দুটি জানালাই ত বন্ধ। টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটাও আঁটা।

শ্রীরঞ্জনবাবু ফত্রিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবুটি কোথায় গেলেন দেখেছিস্?"

—"কৌন বাবু?"

—"যে বাবু একটু আগে এসেছিলেন।"

—"কোনো বাবু ঘরমে ঘুষা নেহি—"

শ্রীরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি তার-ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘরখানা পরীক্ষা ক'রে এলেন। সেখানেও অক্ষয় নেই।

ফত্রিঙ্গা ঘণ্টা দিচ্ছে ; পয়েন্টস্‌ম্যান ফাগু এসে সিগনালের তালার চাবি নিয়ে গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু অন্যমনস্কের মত টিকিট-বাক্সের ডালাটা খুললেন, টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটার ঢাকা সরিয়ে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান দিয়ে একখানা কালো হাত ভিতরে ঢুকল ; ওপাশ থেকে হাতের মালিক বললে—"বাবু, ষষ্টিপুর সাড়ে তিনখানা—" তারপরই শোনা যেতে লাগল টাকা-পয়সার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের সঙ্গে টিকিটের ছাপ দেবার আওয়াজ ঘটাং—ঘটাং—ঘটাং—

হাতের মালিক বললেন—"বাবু! ছুডো পয়সা কম নেন। গরীব মানুষ।"

—"ধ্যেৎ! কই হে, আর কে আছে? এই স'রে যাও ওখান থেকে।"

টিকিট দিতে দিতে শ্রীরঞ্জনবাবু নিজের মনেই ব'লে উঠলেন—"তখন নিশ্চয়ই আমার তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

স্থির করলেন, অক্ষয়কে তাঁর আগমন-সংবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি দেবেন। তবুও তিনি মনে শান্তি পেলেন না। ক্রমে টিকিট দেওয়া শেষ হ'ল। ওদিকে তখন পুব দিক ফরসা হয়ে এসেছে। গাড়ীর 'হুইসিল' শোনা গেল। শ্রীরঞ্জন-বাবু কমফরটারের উপর মাথায় গোল টুপি চড়িয়ে কলম হাতে

প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ী 'হোম সিগনাল' পার হচ্ছে। ঐ ঝিক্‌মিক্ করছে ইঞ্জিনের সামনের আলো।

আবার ঘণ্টা পড়ল। দেখতে দেখতে গাড়ী এসে থামল। যাত্রীরা উঠছে, নামছে, ছুটছে, চীৎকার করছে; দরজা বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। চারধারে ব্যস্ততা ও শব্দ। শ্রীরঞ্জনবাবু গার্ডের গাড়ীর কাছ থেকে মাথার উপর হাত নেড়ে হাঁকলেন—"ঘণ্টা!"

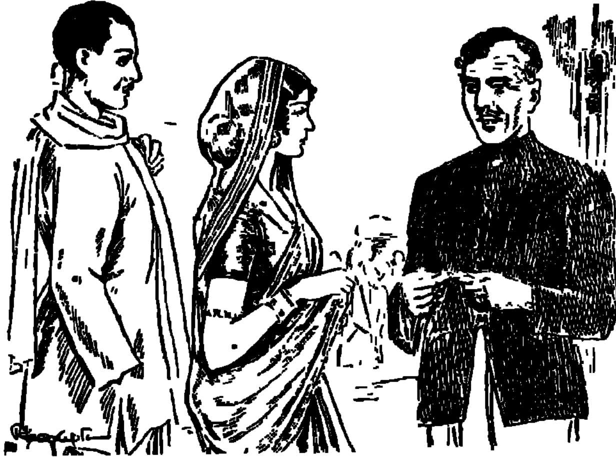
ঘণ্টা পড়ল, গার্ড হুইসিল দিতে দিতে লণ্ঠন দোলাতে লাগল, ইঞ্জিন হুইসিল দিয়ে সশব্দে চলতে আরম্ভ করল। শ্রীরঞ্জনবাবু জন দুই যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ ক'রে ষ্টেশন-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

এদিকে পূবের আলো ততক্ষণে আকাশ বেয়ে পশ্চিমে পৌঁছেচে, নীচের অন্ধকার গলে' পাতলা হয়ে উবে যাচ্ছে, কিছুদূরের মানুষকে বেশ চেনা যায়।

শ্রীরঞ্জনবাবু দেখলেন, একটি যুবক, তার পাশে একটি কিশোরী, তাদের পাশে একজন লোক আসছে। লোকটার মাথায় বিছানা ও ট্রাঙ্ক। তা'রা সেই ট্রেন থেকেই নেমেছে। তা'রাও ষ্টেশন-ঘরের দিকে আসছিল। তার গায়েই ষ্টেশন থেকে বা'র হবার দরজা।

তা'রা তিনজনে শ্রীরঞ্জনবাবুর কাছাকাছি হ'তেই তিনি তাদের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন। দেখেই ব'লে উঠলেন—"অক্ষয়ের জামাই না? ঐত ওর পাশে কমলা। আর ঐযে ওদের রাখাল, মধু। নিশ্চয়ই অক্ষয় এসেছে। আমি স্বপ্ন দেখি নি। কিন্তু সে পালাল কেন?" তারপর উঁচুগলায় বললেন—"বাবাজী যে। ভাল ত? মা কমলা।"

অক্ষয়ের জামাতা বাবাজী ও মেয়ে কমলাও এবার তাঁর দিকে ভাল ক'রে তাকালে।



জামাতা বাবাজী নমস্কার ক'রে বললে—"আজ্ঞে হাঁ

কমলা তাঁর মেয়ে গৌরীর বয়সী। গৌরী নেই। তিনি বললেন—"কেমন আছ? তোমার বাবা ত—"

কমলা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখলেন, তার দু'চোখে জল টলটল করছে। তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে ব'লে উঠলেন—"তোর চোখে জল কেন মা?"

জামাতা বাবাজী বললে—"জানেন না? সাতদিন হ'ল শ্বশুর মশায় স্বর্গারোহণ করেছেন—"

—"কি?"

—"সাতদিন হ'ল মারা গেছেন—"

"কিন্তু আমি যে"—শ্রীরঞ্জনবাবুর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বা'র হ'ল না। ক্ষণিকের জন্য তিনি স্মৃতির মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। সহসা ফত্রিঙ্গার ডাকে ফিরে দেখেন, জামাতা বাবাজীরা তিনজনে গেট পার হয়ে, পথের ধারে একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, ষ্টেশন-ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

সেদিন কোয়ার্টারুসে যাবার আগে তিনি একটাকা সাড়ে তিন আনার হদিস পেলেন, কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে নিশীথে সাক্ষাৎ—স্বপ্ন কি সত্য তার মীমাংসা করতে পারলেন না।



রাত তখন এগারোটা হবে—অণ্ডাল সেখান থেকে তখনও দূর। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। তার মধ্যে আগুনের ফুল্‌কির মত ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি এবং গ্রামের দু'একটি আঁলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বঙ্কুর তবুও ভাল লাগছে। সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে।

তার পাশের যাত্রী একবার বলেছিল—"খোকা, জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, কয়লার গুঁড়ো ঢুকছে।" লোকটা বুড়ো মানুষ—হাঁ, বুড়ো বৈ কি ; ঠাণ্ডায় ভয়ে জড়সড়। তবে কয়লার গুঁড়ো—

বঙ্কু হঠাৎ চোখ রগড়াতে রগড়াতে গাড়ীর ভিতরে মাথাটা টেনে আনলে। উঃ! চোখটা জ্বলে গেল, মনে হচ্ছে যেন লঙ্কার বীচি পড়েছে।

বঙ্কুর সহযাত্রীদের বোধ হয় তখন তন্দ্রা এসেছিল, সেইজন্যে তা'রা কেউ তার অবস্থাটা দেখতে পেলে না ; কিংবা কেউ কেউ দেখেও সেদিকে মনোযোগ দিলে না। বঙ্কু লোকগুলোর উপর মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হ'ল। সৌভাগ্যবশতঃ তার চোখের কয়লা-কণা জলে গলে' পাতার কিনারা দিয়ে বাইরে এল। তার বেশ স্বস্তি বোধ হ'তে লাগল।

সে আবার বাইরের দিকে মুখ ফেরালে, কিন্তু জানালা দিয়ে আর মাথা বাড়াল না।

গাড়ী ছুটেছে···এক্স্‌প্রেস গাড়ী ; যেমন শব্দ তেমনই বেগ। বঙ্কুর মনপথ দিয়েও নানা কথা ছুটতে ছুটতে আসছে যাচ্ছে।

তার একবার মনে হ'ল, যদি কলিশন হয়, যদি রেল থেকে গাড়ী ছিটকে পড়ে, যদি ডাকাতে গাড়ী আক্রমণ করে ? সে তা হ'লে—

তৎক্ষণাৎ তার মনে হ'ল, গাড়ীর গতিবেগ কমে' আসছে ; হাঁ—এ যে কমতে কমতে হঠাৎ থেমে গেল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার ! লক্ষ ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বঙ্কু উঠে জানালা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে দেখতে গেল, ব্যাপারখানা কি !

কে যেন পিছন থেকে হঠাৎ তার ঘাড় চেপে ধরলে—কামরার মধ্যে কে যেন গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। ভয়ে বঙ্কুর হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল। ডাকাত—এ ডাকাত না হয়ে যায় না। কিন্তু তার কাছে ত বিশেষ কিছুই নেই। সে তার আর্থিক অবস্থাটা ডাকাতের কাছে বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বা'র হ'ল না।

সেই সময় সে অনুভব করলে, তার কানের পাশে যেন কিসের শীতল স্পর্শ ! পিস্তল ?

বঙ্কু কখন কখন কল্পনা করত, সে ডাকাতের হাতে পড়লে, তাদের সঙ্গে রীতিমত লড়বে। কিন্তু আজ ? আজকের পরাজয়ের লজ্জা সে ঢাকবে কি দিয়ে ? এরা কাপুরুষ ! না হ'লে পিছন থেকে—

হঠাৎ কে যেন ব'লে উঠল—"এই যে এখানে—"

সেই সঙ্গে ডাকাতটা তার ঘাড় ছেড়ে দিলে। বঙ্কু তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। তার চোখ গিয়ে পড়ল বাইরে। একি ? ষ্টেশন ?

পোর্টার হাঁকছে—"আসানসোল !"

ভোর হয়েছে। অণ্ডাল পিছনে প'ড়ে আছে। সে এত ঘুমিয়ে পড়েছিল ?

সে তাড়াতাড়ি পোঁটলাটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল। কিন্তু তাকে যে এখন আক্কেল-সেলামী দিতে হবে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, পয়সা আছে মাত্র দশটি। অণ্ডালের গাড়ী আসতেও দেরী। এখনই তাকে চেকার ধরবে; তার কাছে মাশুল চাইবে।

সে কয়েক পা যেতেই একজন তার পাশ থেকে বললে—"টিকিট ?"

লোকটার গায়ে কালো কোট, মাথায় কালো টুপি, গায়ের রঙ কালো, চোখের চাহনি ভাল নয়।

বঙ্কু বললে—"মশায়—"

লোকটা চেকার; হাতের পানচ্-যন্ত্রটা উঠিয়ে বললে—"টিকিট দেখাও—"

"দেখাচ্ছি মশায়, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েছি"—বলতে বলতে বঙ্কু বুক-পকেট থেকে টিকিটখানা বার ক'রে লোকটির হাতে দিলে। ভয়ে তার বুক কাঁপছে, তালু শুকিয়ে এসেছে।

লোকটা টিকিটখানা উল্টেপাল্টে দেখে বললে—"চল আমার সঙ্গে—"

—"দেখুন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—"

—"আজকে দণ্ড দিলেই এবার থেকে জেগে থাকবে—"

বঙ্কু শুনেছিল, কোন কোন টিকিট-চেকার ঘুষ খায়। কিন্তু এ লোকটা সম্বন্ধে সে সঠিক কোন ধারণা করতে পারছে না। লোকটা আড়ে বহরে বিশাল—দশ পয়সায় এর পেট নিশ্চয়ই ভরে না। আর পয়সা দশটা একে দিলে সে এখান থেকে অণ্ডাল যাবে কি ক'রে? ষ্টেশন থেকেও তার মামার বাড়ী পাকা হু'ক্রোশ; বাস্-ভাড়া দশ পয়সা।

লোকটা বঙ্কুর হাত ধ'রে বললে—"চল, চল,…এই জমাদার—"

বঙ্কুর পা দুটো যেন চলে না; সে দুর্ব্বলের মত কয়েক পা যেতেই লোকটা বললে—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

—"শ্রীরামপুর—"

—"অণ্ডালে কোথায় যাবে?"

—"ফুলকুড়ি গ্রাম—"

—"ফুলকুড়ি? কোথায়?…তুই বঙ্কা না?"

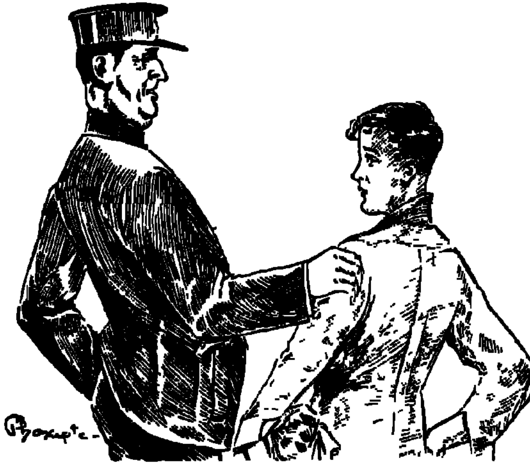
—"আ—মি—হাঁ—আপনি—?"

—"চিনতে পারছিস্ না?"

"রঘুদা?"—বঙ্কুর হাত-পা আনন্দের উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

রঘুদা বললেন—"তুই এত বড় হয়েছিস্?"

বঙ্কুর কেমন লজ্জা বোধ হ'ল; সে ঘাড় নীচু ক'রে রইল। তারপর বললে—"আপনি আমাকে পুলিশে দিতে যাচ্ছেন?"



রঘুদা তাকে বললেন—"পুলিশ তোকে নিয়ে কি করত? আমি হয়ত দু'-চারটে চড়-চাপড় লাগাতাম। যাক্—বড় বেঁচে গেছিস্। এখন চল্—খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে ওবেলা—"

বঙ্কু পোঁটলার দিকে তাকিয়ে বললে—"না—এখনই যে গাড়ী পাব—"

—"কেন রে? ওতে কি আছে?"

বঙ্কু জড়িতকণ্ঠে বললে—"আমসত্ব।"

রঘুদার মত লম্বা চওড়া যোয়ানেরও জিভ রসিয়ে উঠল ; ঢোক গিলে বললে—"ভয় নেই, আমি কেড়ে খাব না। চল্—চল্—"

রঘুদা বঙ্কুর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। বঙ্কুর আপত্তি সেই টানে ভেসে গেল।

সেদিন দুপুরের দিকে বঙ্কু আবার রেলে উঠে অণ্ডালের দিকে চলল। কিন্তু তখন তার পোঁটলায় আমসত্ত্ব নেই ; তার বদলে তার সঙ্গে এক চাঙারি মিহিদানা ও কাঁচাগোল্লা। একে দুপুর, তার উপর সঙ্গে এমন দুটি সুখাদ্য। বঙ্কু খুব সজাগ হয়েই ব'সে রইল। তার চোখ দুটো ঘুরতে লাগল বাইরে, মন ঘোরাফেরা করতে লাগল চাঙাড়ির ভিতর।

—শেষ—